([illegible])

الحمد لله مُعِز الإسلام بنصره, ومُذِل الشرك بقَهره ,
ومُصرف الأمور بأمره ,
ومُستدرج الكافرين بمَكره , الذي قَدَّرَ الأيام دولاً بعَدلِه ,
والصلاة والسلام على من أعلى منار الإسلام بسيفه أما بعد .. ..

[illegible]

[illegible] **{ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين}**

[illegible] **(ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين)**

[illegible]

حرب العصابات/[illegible]

[illegible]

[illegible]

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (60)

[illegible]

روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف

[illegible]

[illegible]

{وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ}

[illegible]

[illegible]

প্রথমত আক্বিদার শক্তি , আল্লাহর উপর ভরসা করার শক্তি এবং ঈমানী শক্তি অর্জন করা। অতপর অর্থনৈতিক শক্তি , রাজনৈতিক শক্তি ও প্রশাসনিক শক্তি অর্জন ও সর্বশেষ সামরিক শক্তি অর্জন করা। আগ্রাসী শত্রুকে প্রতিহত করার জন্য আমাদের এই সর্ব প্রকার শক্তি প্রয়োজন। সুতরাং প্রথমে শক্তির অর্জনের বিষয়টা বোঝা জরুরী।

শক্তির দ্বারা উদ্দেশ্যঃ

শাইখ মোহাম্মদ আমিন শানক্বিতি "শক্তির মাসয়ালায় " উল্লেখ করেছেনঃ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তায়ালার উক্ত আয়াত 'তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি অর্জন করো ' তেলাওয়াত করার পর বলেছেনঃ

" ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي "

'জেনে রাখো , শক্তি হচ্ছে নিক্ষেপণ , শক্তি হচ্ছে নিক্ষেপন , শক্তি হচ্ছে নিক্ষেপন '। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা 'শক্তি হচ্ছে নিক্ষেপ করা ' এর অর্থ শুধু এই শক্তিতেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং এটা আয়াতের ব্যাপক অর্থের মধ্য হতে একটা বিশেষ অর্থ যা আল্লাহ বলেছেনঃ 'তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি অর্জন করো'। তবে আল্লাহর নবী উক্ত হাদীসে বর্ণিত শক্তি দ্বারা উদ্দেশ্য হল প্রতিহত করার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হচ্ছে "নিক্ষেপণ শক্তি "।

সুতরাং আমাদের জন্য আবশ্যক হচ্ছে প্রস্তুতি নেওয়া এবং আক্রমণকারী শত্রুদেরকে প্রতিহত করার জন্য সামর্থ্য অনুযায়ী যুদ্ধের সরঞ্জাম তৈরি করা। এবং বর্তমান সময়ে আগ্রাসী শত্রুকে প্রতিহত করার জন্য সামরিক জ্ঞান অর্জন করাও আবশ্যক। এই জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্য হল , আমরা চাই আক্রমণকারী শত্রুদের সাথে গেরিলা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করব।

যুদ্ধের প্রকারবেধ

فالحرب تنقسم إلى أقسام، أو هي أنواع؛ فالحرب النظامية إما أن تكون حرباً تقليدية،

যুদ্ধ কয়েক প্রকারে বিভক্ত।
প্রথমতঃ **الحرب النظامية/** প্রচলিত যুদ্ধ বা কনভেনশনাল ওয়ারফেয়ার।
যেখানে গতানুগতিক যুদ্ধ হবে। স্বাভাবিক যুদ্ধ বলতে দুইটি সৈন্যদলের মাঝে যে যুদ্ধ হয় সেটা উদ্দেশ্য। আর গতানুগতিক বলা হয় , যে যুদ্ধে প্রথাগত বা প্রচলিত অস্ত্র ব্যবহার করা হয়। যেমন ট্যাঙ্ক , কামান ও মাঝারি ও হালকা অস্ত্র , মাঝারি অস্ত্রের যুদ্ধবিমান এবং প্রচলিত ক্ষেপণাস্ত্র।
দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে **, حربٌ غير تقليدية،**/অস্বাভাবিক যুদ্ধ।
এটা সেই যুদ্ধেকে বলা হয় , যে যুদ্ধে জীবাণু অস্ত্র , পারমাণবিক অস্ত্র , রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করা হয় অথবা আমাদের যুগে ব্যপক ধ্বংসের জন্যে ব্যবহৃত অস্ত্রগুলো। যা স্বাভাবিক যুদ্ধ বা প্রচলিত যুদ্ধকে অগতানুগতিক যুদ্ধে পরিনত করে।

তৃতীয় আরেকটি প্রকার হল **حرب العصابات** / গেরিলা যুদ্ধ।
এটাই আমাদের আলোচনার বিষয়। যেহেতু আজ মুসলমানদের কোনো রাষ্ট্র নেই ,কোন বাহিনী বা স্থিতি নেই। অথচ সকল বিধর্মী জাতিগুলোর নিজস্ব অবস্থান রয়েছে। হিন্দু - মূর্তিপূজক , ইয়াহুদী -খ্রিষ্টান ; পূর্বে যারা মুসলিমদের জিজিয়া দিয়ে থাকত। তাদের এখন রাষ্ট ,ক্ষমতা , প্রশাসন ও সৈন্যবাহিনী আছে। অথচ মুসলিমদের এই সবের কিছুই নেই। তাই আমাদের উপর গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে কাজ শুরু করা আবশ্যক।

আমরা গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে শত্রুদেরকে প্রতিহত করবো , কারণ এটাই তাদের সেনাদের সামনে মূল বাধা। আর এটাই হল একমাত্র পথ ; যার মাধ্যমে আমরা শত্রুদেরকে কাবু করতে সক্ষম। সুতরাং গেরিলা যুদ্ধ হল একটি অপ্রচলিত যুদ্ধ /

حربٌ غير تقليدية, যেখানে গেরিলারা এমন অনেক পদ্ধতি ব্যবহার করে , যা তাদের সংখ্যা স্বল্পতা আধিক্যে পরিনত করে। দুর্বলতাকে শক্তিতে পরিনত করে।

فهذه الأساليب متعددة؛ منها ما هو استراتيجي، ومنها ما هو تكتيكي سنصل إلى الحديث عنه،

এখানে কিছু পদ্ধতি রয়েছে , যার একটি হলো স্ট্রেটেজিক আরেকটি হল টেক্টিক্যাল , এগুলোর আলোচনা আমরা সামনে করবো।

গেরিলা যুদ্ধের ক্ষেত্রসমূহ

গেরিলা যুদ্ধ চার প্রকারঃ

- **حرب العصابات في الجبال** / পার্বত্য গেরিলা যুদ্ধ।
- **حرب العصابات في الأدغال** / জঙ্গল গেরিলা যুদ্ধ।
- **حرب العصابات في المدن** / শহর কেন্দ্রিক গেরিলা যুদ্ধ।
- আর চতুর্থটি যা স্বভাবত চর্চা করা হয় না , এর নির্দিষ্ট কোন পদ্ধতি নেই ; কারণ গেরিলাদের জন্যে এটা উপযুক্ত নয় , তা হলঃ **حرب العصابات في الصحاري** / মরুভূমিতে গেরিলা যুদ্ধ।

  এই চারটি হলো গেরিলা যুদ্ধের প্রকার। এই যুদ্ধগুলোর প্রত্যেকটির আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

فحرب الأدغال من أعظم ميّزاتها أنها تَشُلُّ حركة الطيران

“জঙ্গল গেরিলা যুদ্ধের ” বড় বৈশিষ্ট্য হলো বিমান আক্রমনকে অসাড় করে দেয়। কেননা এক্ষেত্রে যোদ্ধাকে বিমানের দৃষ্টি থেকে আড়ালে রাখে।শত্রু যদি বিমানে থাকে যেমনটা বর্তমানে আমেরিকার অবস্থা , তাহলে উত্তম হলো গেরিলা যুদ্ধের জন্যে জংগলে এমন জায়গা নির্ধারণ করা যার মাধ্যমে শত্রু বিমানের শক্তিকে অকেজো করা যায়।

পার্বত্য এলাকায় যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য হলো **,**

পাহাড়ে শত্রুর যুদ্ধযান ও অস্ত্রকে অক্ষম করে দেয়া। সুতরাং যদি তোমার শত্রু অস্ত্র চালনায় দক্ষ হয় তাহলে এমন পার্বত্য ভূমি নির্বাচন করো, যা শত্রুর অস্ত্র-সরঞ্জামকে অকেজো করে দিবে। তারা যদি বিমান নিয়েও আসে তাহলে উপর থেকে সহজেই পর্যুদস্ত করা সম্ভব। শত্রু যখন ভারী যন্ত্রপাতি নিয়ে গেরিলাদের অঞ্চলে আসবে এবং ট্যাঙ্ক ও ভারি অস্ত্র ব্যবহার করবে। তখন শত্রুর সাথে তার অস্ত্রশস্ত্রও ধ্বংস করতে সক্ষম হবে। তাই হিকমাহ হচ্ছে, গভীর ভাবে পর্যবেক্ষন করো, তোমার শত্রুর শক্তির উৎস কোথায়। এবং এমন সুবিধাজনক স্থান নির্বাচন করো যেখানে তার শক্তির মূল অংশকে ধ্বংস করে দিতে সক্ষম হবে।

“শহর কেন্দ্রিক গেরিলা যুদ্ধে” ভিন্ন একটি পদ্ধতি অনুসরন করা হয়। তবে যদি সফলতার সাথে তা বাস্তবায়ন করা যায়, তাহলে শত্রু তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অস্ত্রই আর ব্যবহার করতে পারবে না। কারণ শহর কেন্দ্রিক যুদ্ধ এমন একটি যুদ্ধ, যেখানে শত্রুর সকল শক্তি খর্ব করা সম্ভব। যদি তুমি সঠিকভাবে যুদ্ধের নিয়ম বাস্তবায়ন করতে পারো, তাহলে শত্রু তোমার বিরুদ্ধে বিমান, ট্যাঙ্ক বা ভারি কোন অস্ত্র ব্যবহার করতে পারবে না। তবে শহরের যুদ্ধ সাধারণ যুদ্ধের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন যুদ্ধ।

চতুর্থ হচ্ছে মরুভূমির যুদ্ধ।
মরু অঞ্চলের যুদ্ধ গেরিলাদের সক্ষমতাকে নষ্ট করে দেয়। আর শত্রুকে বিমান, ক্ষেপনাস্ত্র সহ যুদ্ধের সমস্ত অস্ত্র ব্যবহারের সুযোগ করে দেয়। এমন কোন বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায় না যেখানে যুদ্ধের কোন মাঠ নির্বাচন করা বা আক্রমণ করার কোন ব্যবস্থা নেওয়া যায়।

এখন আমরা গেরিলা যুদ্ধের স্ট্র্যাটেজি সম্পর্কে আলোকপাত করবো, যাতে তোমার সামর্থ্য অনুপাতে গেরিলা যুদ্ধের উল্লেখিত ক্ষেত্রগুলোতে তা যথাযথ বাস্তবায়ন

করতে পারো। এরপর তোমার ও শত্রু র সক্ষমতা ও সুযোগ বুঝে রণকৌশল অবলম্বন করতে পারো।

গতানুগতিক ধারার একটা বাহিনীর বিন্যাস কেমন হবে

আমাদের এটা জানা জরুরি, শত্রু সেনা যখন কাজ করে তখন নির্দিষ্ট অবকাঠামো অনুযায়ী কাজ করে। শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহনের পূর্বেই শত্রুর সেই বিন্যাসটা জেনে নেয়া আবশ্যক। কারণ এখানে তাদের মধ্যে সম্পর্কের যে জোড়াগুলো আছে তা ব্যবহার করা ও শত্রুর জোড়ায় বা গ্রন্থিতে আঘাত করা আবশ্যক। মনে করো, তুমি কারো হাত নষ্ট করতে চাইছো, এখন তার বাহু ধরে যদি হাড়ে আঘাত করো;তবে তাতে সক্ষম হবে না। কিন্তু যদি তুমি তার হাড়েরজোড়ায় আঘাত কর, তাহলে সহজেই তা শরীর থেকে ছিড়ে আলাদা হয়ে যাবে।

গেরিলারা যখন তার শত্রু র ব্যাপারে জানতে চায়, তখন তারা এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই দেখে।তারা শত্রুর জোড়াগুলো অনুসন্ধান করে যাতে আঘাতের ফলে শত্রুর মুভমেন্ট (চলাফেরা) বন্ধ হয়ে যায়। এই পদ্ধতি হলো শক্তিকে আঘাত করার সবচেয়ে সহজ মাধ্যম। শৃঙ্খলাবদ্ধ বাহিনী যখন কাজ করে তখন তারা নির্দিষ্ট বিন্যাস অনুযায়ী কাজ করে, চেইন বাই চেইন পরিচালিত হয়। সামরিক শক্তিও এইভাবে পরিচালিত হয়। সুতরাং তোমার প্রয়োজন শত্রুর বিন্যাস ও কাজের অবকাঠামো সম্পর্কে জানা, যাতে সঠিকভাবে আক্রমন করতে পারো।

আর্মি যখন সারিবদ্ধ হয় তখন বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়। সাধারণত সব যুদ্ধেই সম্পূর্ন সেনাদলকে দুই ভাগ করা হয়, একটি থাকে পশ্চিম দিকে ও আরেকটি পূর্ব দিকে।
বাহিনীদ্বয়েরঅধীনে সেনাদেরকে বিভিন্ন দলে ভাগ করা হয়।
সৈনিকেরা যখন কোন পদক্ষেপ নিতে ইচ্ছে করে তখন এই বিন্যাসের আলোকে পদক্ষেপ নেয়। এবং তাদের দলগুলোর একত্র

হওয়া বা আক্রমন করা , সবই নির্দিষ্ট বিন্যাস মেনে হওয়া আবশ্যক।

فأصغر تقسيم لدى العدو هي «المجموعة»، والمجموعة من 9 إلى 12 فرداً،

মাজমুয়াঃ শত্রুর সবচেয়ে ছোট দল হল 'মাজমুয়া' বা ইউনিট। প্রত্যেকটা মাজমুয়াতে ৯ থেকে ১২ জন সেনা থাকে।

তারপর

«الفصيل» ويتكون من ثلاث مجموعات فيتراوح من بين 33 إلى 50 حَسَبَ التدعيم الذي يُمَد به هذا الفصيل - والتدعيم سنتكلم عنه

ফাসীলঃ তিনটি মাজমুয়া নিয়ে 'ফাসীল' বা প্লাটুন গঠিত। "রিইনফোর্সমেন্ট" উপর ভিত্তি করে এ গ্রুপে সেনা থাকে ৩৩ থেকে ৫০ এর ভিতর। (রিইনফোর্সমেন্ট এর ব্যপারে পরবর্তীতে আলোচনা করা হবে।)

তারপর

السَرية»، والسرية ثلاث فصائل، فتتراوح ما بين 100 إلى» 150 فرداً،

সারিয়্যাহঃ তিনটি 'ফাসীল' নিয়ে গঠিত দলকে বলা হয় সারিয়্যাহ বা কোম্পানি। একে স্কোয়াড্রন ও বলা যেতে পারে। এতে থাকে ১০০ থেকে ১৫০ জন সেনা।

তারপর

«الكتيبة»، والكتيبة من ثلاث إلى أربع سرايا،

কাতীবাঃ 'কাতীবা' বা ব্যাটালিয়ন/রেজিমেন্ট, যা তিন থেকে চারটি সারিয়্যাহ নিয়ে গঠিত হয়।৫০০ -৬০০

তারপর

«اللواء»، واللواء يتكون من ثلاث إلى أربع كتائب»،

লিওয়াঃ তিন থেকে চারটি 'কাতীবা' নিয়ে গঠিত হয় একটি বা ব্রিগেড।১৫০০ -১৮০০

তারপর

«الفرقة» وتتكون من ثلاث إلى أربع ألوية،
ফিরক্বাহঃ তিন বা চারটি লিওয়া মিলে একটি ‘ফিরক্বাহ’ বা ডিভিশন। সাড়ে পাচ থেকে ছয় হাজার
তারপর
«الفيلق» ويتكون من ثلاث إلى أربع فِرَق، ثم بعد ذلك«
ফাইলাক্বঃ তিন বা চারটি ফিরক্বাহ মিলে একটা ‘ফাইলাক্ব’।১৫-১৮ হাজার
তারপর
الجيش ويتكون من ثلاث إلى أربع فيالق.

জাইসঃতিন বা চারটি ‘ফাইলাক্ব’ মিলে একটি জাইস বা সেনাদল গঠিত হয়। ৪৫ -৫০ হাজার
هكذا هي التقسيمات لدى العدو، أو لدى الجيوش النظامية.
এটাই হল শত্রু বাহিনীর স্বাভাবিক সেনা বিন্যাস বা শৃঙ্খলাবদ্ধ বাহিনীর বিন্যাস। এখানে কোন কাতীবা এমন পাওয়া যাবে না যেখানে ৪০০ জন সেনা রয়েছে, যা তিন /চারটি সারিয়্যাহ নিয়ে গঠিত। বরং প্রত্যেকটি কাতীবাতে কমপক্ষে ৫০০ সেনা থাকবে। এটা কেন? কারন অধিকাংশ সময় প্রত্যেকটা কাতীবা অন্যদের সাহায্য নিয়ে গঠিত হয়। ‘রিইনফোর্সমেন্ট’ হচ্ছে এই কাতীবার বাহির থেকে বিভিন্ন ইউনিট, প্লাটুন বা কোম্পানী থেকে সাহায্য নেয়া। উদাহারনত, কোন পদাতিক কাতীবা গঠিত হয় ট্যাংক পরিচালনাকারী বাহিনীর থেকে সহযোগিতা নিয়ে।

الجيوش تتكون من ثلاثة أركان: البريّة، والبحريّة، والجويّة.

সেনাদল তিন ধরনের হয়ে থাকেঃ
স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী।

فكتيبة برية لا بد أن تُدَعَّم بشيء من الأركان الثلاثة،
সুতরাং যখন স্থলবাহিনীর কোন কাতীবা তৈরি করা হবে, তখন অবশ্যই ‘রিইনফোর্সমেন্ট’ করতে হবে। কারণ তারা যুদ্ধের ভূমিতে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। অতএব স্থলবাহিনীকে অন্যান্য বাহিনীর পক্ষ থেকে সহায়তা করা আবশ্যক।যুদ্ধ

যদি স্থলের হয় তাহলে নৌবাহিনীর সাহায্য প্রয়োজন হতে পারে , কেননা যুদ্ধের ময়দানে কখনো নদী বা সমুদ্র উপকূলে কাজ করা বা নদী -সমুদ্রের কাছাকাছি অবতরণ করা প্রয়োজন হবে। তাই নৌবাহিনী দ্বারা সহায়তা করা হয়। অন্যদিকে হয়ত স্থলের সেনারা এমন অঞ্চলে প্রবেশ করবে যেখানে শত্রুরা বিমান হামলা করবে , সে ক্ষেত্রে বিমান বাহিনী সাহায্য প্রয়োজন। যাতে আকাশ প্রতিরক্ষা করা বা রকেট লাঞ্চার ব্যবহার করা যেতে পারে। অথবা প্রতিরোধের জন্যে নয় বরং বিমান বাহিনীর শক্তি দ্বারা উপর থেকে এই কাতীবাকে সহায়তা ও প্রটেকশন দেয়া হয়। সুতরাং যখন কোন সাহায্যপ্রাপ্ত কাতীবা তৈরি হবে , তখন সেখানে এই বাহিনীর সংখ্যা ৫০০ অথবা ৬০০ এর উপরে চলে যাবে , যাদেরকে প্রয়োজন অনুপাতে সাহায্য করা হবে।

শত্রুর বাহিনীর আরো বিশেষ কিছু ভাগ থাকে , যেমনঃ **مُضاد الدبابات، أو مُضاد الدروع، / مُضاد الطائرات.**
ট্যাংক প্রতিরক্ষা বাহিনী বা আকাশ প্রতিরক্ষা বাহিনী।

এদের নিকট রয়েছে "**سلاح المهندسين** / ইঞ্জিনিয়ারিং বিগ্রেড " যা বিশেষভাবে 'কাতীবা ' এর অগ্রগতির জন্য সড়কপথ নিরাপদ করার কাজ করে। সব ধরনের মাইন , কাঁটাতার , পরিক্ষা ইত্যাদি সব সমস্যা সমাধান করে। যদি সেখানে কোন ভাঙ্গা ব্রীজ থাকে তাহলে তা নতুন ব্রীজ তৈরি করে দিবে চলাচলের জন্যে। মোটকথা , তাদের কাজ হচ্ছে রুট ক্লিয়ার রাখা।

শত্রুর রয়েছে "**سلاح الإشارة** / সিগন্যাল কর্পস [1]", যা ব্যবহার করে বিভিন্ন মাজমুয়া , সারিয়্যাহ ও কাতীবাগুলো মাঝে যোগাযোগ সচল রাখা হয়। আছে **الملاحة** / নেভিগেশন যন্ত্র - যা সেনাদের ভ্রমণ নিরূপণের জন্য ব্যবহার করা হয় এবং শত্রুর কেন্দ্র বা ঘাঁটি নিরূপণের জন্য , শুটিং

---

1 "সিগন্যাল কর্পস "হ'ল সেনাবাহিনীর অধীন বিভিন্ন সামরিক যোগাযোগের (যেমনঃ রেডিও , টেলিফোন এবং ডিজিটাল যোগাযোগ ইত্যাদি) জন্য দায়িত্বশীল একটি সামরিক শাখা। উদাহরণস্বরূপঃ Signal Corps (United States Army)
বিস্তারিতঃ https://en.wikipedia.org/wiki/Signal_Corps_(United_States_Army)

পয়েন্ট নিরূপণের জন্য এবং প্রত্যেক প্রয়োজনীয় দূরত্ব বা গতি নির্ধারণের জন্য বিশেষভাবে ব্যবহার করা হয়।

فهذا يُخَصص في مجموعات الطبوغرافية (Topography)، أو الملاحة.

এটা হল topography বা নেভিগেশন গ্রুপের কাজ।

এখন সেনাদলের বিন্যাস সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর , শুধু সেনাপতিকে দেখেই বলতে পারবে তাদের সংখ্যা কত। যেমন একজন কর্নেল একটি কাতীবার এর বেশি পরিচালনা করতে পারে না। সুতরাং যখন তুমি কর্নেল দেখবে তখন বুঝে নিবে তোমার সামনে কাতীবা থেকে কম। আর কোন জেনারেল দেখবে তখন বুঝবে তোমার সামনে থাকা সৈন্য কাতীবা থেকে বেশি। সুতরাং এই ভাবে শুধু কমান্ডারকে দেখে কোন এলাকার সৈন্য সংখ্যা বলে দিতে পারবে।

শত্রুদের পরিচালনা পদ্ধতি

শত্রুরা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হওয়া ছাড়া কোন পদক্ষেপ নিতে পারে না। তারা সর্বদা একে অপরের সাথে মিলিত থাকে। সুতরাং শত্রুর জন্য এটাও মোটেই সম্ভব নয় যে , সে এক অঞ্চলে প্রবেশ করবে আর পিছনের অঞ্চলকে খালি ছেড়ে দেবে। তার জন্য আবশ্যক হল এটা জেনে অগ্রসর হওয়া যে , তার সরবরাহ লাইন নিরাপদ এবং তা ছিন্ন করা যাবে না এবং সেনাদলের পাশের অক্ষগুলো শক্তিশালী ও পিছনের দিক থেকে আক্রমণ করা সম্ভব নাএবং কোন পদক্ষেপ নিতে হলে চিন্তাভাবনা করে নিবে। এই সবগুলোই কোন বাহিনীর জন্য অকাট্য স্ট্রাটেজি যা বাধ্য হওয়া ছাড়া কখনোই পরিবর্তিত হয় না।

فمثلاً السرية تتحرك في 50 كيلومتر مربّع، يعني تُعطى مربّع تتحرك خلال 50 كم

উদাহরণসরূপঃ

একটি সারিয়্যাহ ৫০ বর্গকিলোমিটার মধ্যে কাজ করতে পারে। অর্থাৎ ৫০ কিলোমিটারের মধ্যে আক্রমন পরিচালনা করতে সক্ষম। তাই কোন সারিয়্যাহ ১০০ , ২০০ বা ৩০০ বর্গ মাইলের মধ্যে পদক্ষেপ গ্রহন করতে পারবে না , যদি রসদ সরবরাহ নিরাপদ রাখতে চায়। যখন তুমি শত্রু চারপাশে বা সরবরাহ লাইনের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নিবে , তখন দেখবে শত্রু এমন সংকীর্ণ জায়গা বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছে , যে অঞ্চল তার জন্য পূর্ণাঙ্গভাবে নিয়ন্ত্রন করা সম্ভব। সুতরাং শত্রুর সেনারা বিক্ষিপ্তভাবে কোন কাজ করতে পারে না , বরং এক সাথে সবাই মিলে পদক্ষেপ নেয়া জরুরী। এটাই হলো গতানুগতিক সেনাদলের দূর্বল পয়েন্ট এবং গেরিলাদের জন্য একটি বিশাল শক্তি। কারণ তারা শৃঙ্খলাবদ্ধ কোন পদক্ষেপ নেয় না , তাদের কোন সীমা পরিধি নেই এবং তাদের এমন কোন অঞ্চল নেই যা রক্ষা করতে হবে বা পরিচালনা করতে হবে। আর তাঁদের কোন নির্দিষ্ট রসদ সরবরাহের লাইন থাকে না। আল্লাহর তাওফীকের পরে এগুলোই সেই বৈশিষ্ট্য , যা একজন গেরিলাকে প্রচুর শক্তি দান করে। অতএব তুমি প্রয়োজনে তোমার শত্রুর দূর্বলতা কাজে লাগাবে এবং তোমার শক্তি উন্নত ও বৃদ্ধি করবে।

فالعدو إذا أراد أن يتحرك أو يدخل ميدان المعركة، فعلى سبيل المثال حلف الناتو (NATO)؛ حينما يريد جيش مكون من 100 ألف أن يخوض معركة في حلف الناتو، تجد أن 40 ألف يدخلون المعركة، و 60 ألف يكونون لهم دعماً لوجستياً، والدعم اللوجستي يشمل عدة أمور؛ فهو يشمل التغذية، والتسليح، والإسعافات، وكل ما يحتاجه المقاتل في ميدان المعركة، لا بد أن يكون هناك دعم لوجستي لهذا المقاتل؛ يقاتل 40 ألف، دعم لوجستي 60 ألف.

حلف وارسو (Warsaw Pact) «الاتحاد السوفييتي ومن معه» إذا كان لديهم 100 ألف، يدخل 70 ألف لأرض المعركة و 30 ألف يكونون دعماً لوجستياً لـ 70 ألف مقاتل.

শত্রু যখন কোন পদক্ষেপ নিতে ইচ্ছে করে বা যুদ্ধের ময়দানে প্রবেশ করতে চায় , যেমন ন্যাটো বাহিনী। যদি তাদের এক লক্ষ সৈন্য নিয়ে যুদ্ধে নামে , তখন ৪০ হাজার

সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে , আর 60 হাজার সরবরাহের কাজে অংশ নেয়। সরবরাহের কাজ বলতে খাবার বহন , অস্ত্র বহন, চিকিৎসা সহ যুদ্ধের সমস্ত প্রয়োজনের জন্য নিয়োজিত বাহিনী।

অন্যদিকে (warsaw pact[2])সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন এক লক্ষ নিয়ে মাঠে নামে , তখন ৭০ হাজার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে ও বাকি ৩০ হাজার যুদ্ধে সহযোগীতা মূলক কাজে নিয়োজিত থাকে।

উপরোক্ত আলোচনায় শত্রুর পরিচালনা পদ্ধতি , সৈন্যদের বিভাগ বিন্যাস এবং শত্রুকে দূর্বল করা বা আক্রমণ করার দূর্বল দিক গুলো জানা গেছে।

الجيش له سُلَّم إداري، له سُلَّم عسكري،

শত্রুদের রয়েছে প্রশাসনিক স্তর এবং সামরিক স্তর।
তাদের জন্য সুনির্দিষ্ট বিন্যাসের আলোকে চলাচল করা এবং নির্দিষ্ট স্থান বা (বর্গকিলোঃ) গন্ডিতে পদক্ষেপ নেওয়া আবশ্যক। তাদের রয়েছে নির্দিষ্ট সরবরাহ লাইন , রয়েছে নির্দিষ্ট কিছু স্থান বা অঞ্চল রক্ষার দায়িত্ব , সেগুলো রক্ষা করা আবশ্যক। কিন্তু গেরিলাদের

---

2 ওয়ারশহলো পোল্যান্ডের রাজধানী ও সবচেয়ে বড় শহর। ওয়ারশ চুক্তি (বন্ধুত্ব , সহযোগীতা এবং পারস্পরিক সহায়তার চুক্তি হিসেবে পরিচিত , সংক্ষেপে ওয়ারপ্যাক , ন্যাটোর গঠনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ) ছিল স্নায়ুযুদ্ধ চলাকালীন কেন্দ্রীয় ও পূর্ব ইউরোপের আটটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত সম্মিলিত প্রতিরক্ষা চুক্তি। ওয়ারশ চুক্তি কাউন্সিল ফর মিউচুয়াল ইকোনোমিক অ্যাসিসটেন্স (**COMECON**)-এর সাথে সামরিক দিক দিয়ে সম্পূরক ছিল। **COMECON** কেন্দ্রীয় ও পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আঞ্চলিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান ছিল। ওয়ারশ চুক্তি মূলত ১৯৫৪ সালের প্যারিস চুক্তির ভিত্তিতে ১৯৫৫ সালে ন্যাটোর সাথে পশ্চিম বাহিনীর একত্রীকরণের পরিপ্রেক্ষিতে সোভিয়েত সামরিক বাহিনীর প্রতিক্রিয়া ছিল। প্রাথমিকভাবে কেন্দ্রীয় ও পূর্ব ইউরোপের সামরিক বাহিনী সোভিয়েতের ইচ্ছা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হত। পর্যায়ক্রমে , (ওয়ারশ চুক্তির প্রস্তাবনা অনুযায়ী) জাতিসংঘের সনদ নীতিমালা অনুযায়ী ইউরোপে শান্তি বজায় রাখাই এই চুক্তির উদ্দেশ্য হয়ে পড়ে (১৯৪৫)। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন এবং স্নায়ুযুদ্ধের সমাপ্তির পরে , এই মৈত্রী একটি সম্মিলিত নিরাপত্তাজনিত চুক্তিভিত্তিক সংস্থা বা সিএসটিওতে পরিণত হয়। ১৯৯১ সালের ৩১শে মার্চ ওয়ারশ চুক্তিকে বিলুপ্ত বলে ঘোষণা করা হয়।

জন্য এগুলোর কোনো প্রয়োজন নেই। তাদের না আছে কোন নির্দিষ্ট সীমা, না আছে সরবরাহ লাইন বা কোন অঞ্চল রক্ষার দ্বায়িত্ব। চলাচলের নির্দিষ্ট কোন নীতি নেই। অথবা এমন কোন বিন্যাস কাঠামো নেই যা রক্ষা করে পদক্ষেপ নিতে হবে। এবং তাদের সামরিক চেইন অবস্থানের প্রেক্ষিতে পরিবর্তন হতে থাকে।

যখন তুমি গতানুগতিক সৈন্যদের দূর্বল পয়েন্ট সমূহ এবং গেরিলা যুদ্ধের শক্তির রহস্য বুঝতে সক্ষম হয়েছো, তখন তোমার জন্য আবশ্যক হলো তোমার এবং শত্রুর কৌশলের মধ্যে পার্থক্য করা। অর্থাৎতারা যে সিস্টেমে প্রতিরোধ করবে তোমার উচিত ভিন্ন সিস্টেমে আক্রমন করা। যদি শত্রুর কৌশল প্রয়োগ করে আক্রমন করো তাহলে তুমি ব্যর্থ হবে, কারণ তারা শক্তি এবং সৈন্য সংখ্যায় তোমার চেয়ে বেশি। অতএব তোমার উচিত হল ভিন্ন কোন কৌশল ফলো করে কাজ করা, যার মাধ্যমে শত্রুকে পরাস্ত করতে পারবে।

গেরিলা যুদ্ধের আলোচনা

আমরা এতক্ষন গতানুগতিক সেনাবাহিনী পরিচয় জেনেছি, এখন গেরিলা যুদ্ধের পরিচয় জানবো।

فالعلوم العسكرية اختُلِفَ هل هي علم أم معرفة، يعني تؤخذ بالتجربة أم هي علم تُدرَس أم هو علم الحرب والعلوم العسكرية تُدرَس فتُعرَف، فالصحيح أنها علم ولا يمكن لرجل من خلال التجربة فقط أن يبلغ منزلة الرجل الذي درس وجرَّب، فالعلوم العسكرية بدأت منذ القِدَم من قبل الإسلام والأفكار العسكرية والخطط الحربية تتطور كلما تطور الصراع بين الأمم أو بين الشعوب أو بين الأفراد تجد أنه يتطور باستمرار.

সামরিক জ্ঞান সম্পর্কে মতভেদ আছে, এটা কি অভিজ্ঞতার আলোকে বুঝা যাবে নাকি এমন ইলম যা পাঠদানের মাধ্যমে অর্জিত হবে। সঠিক কথা হলো এটা এমন বিষয় যা শুধু

অভিজ্ঞতার আলোকে বুঝা সম্ভব না। এটার ব্যাপারে সঠিক ইলম পাঠদান ও অভিজ্ঞতার সমন্বয়ের মাধ্যমে অর্জিত হবে।

ইসলাম পূর্ব থেকেই সামরিক জ্ঞানের চর্চা চলে আসছে। যেখানেই কোন দেশ, জাতি বা দলের মাঝে যুদ্ধ হবে সেখানেই ধারবাহিক ভাবে যুদ্ধবিদ্যা ও লড়াইয়ের কৌশলের উন্নতি ঘটে থাকে। গেরিলা যুদ্ধের উন্নতিগুলো নতুন নীতিমালার মাধ্যমেই হয়ে থাকে।
১৮’শ সালে কমান্ডার ‘কার্ল ফন ক্লাউসউইটজ

3

’ সর্ব প্রথম
সামরিক বিজ্ঞান, সামরিক পরিকল্পনা, ট্যাকটিক ও স্ট্রেটেজিগুলোকে লিপিবদ্ধ করেন।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে ট্যাকটিক ও স্ট্রাটেজির পরিচয় আলোচনা করছি।

• স্ট্রাটেজি হল স্থির পরিকল্পনা, স্থায়ী রণকৌশল ও এমন গুরুত্বপূর্ন বিষয় যা কখনোই পরিবর্তিত হয় না। সুতরাং অটল ও আবশ্যকীয় বিষয়কে স্ট্রাটেজি বলা হয়।
• অন্যদিকে ট্যাকটিক হল পরিবর্তনশীল, যা ছেড়ে দেয়া সম্ভব। অর্থাৎ এমন কৌশল যা সময়, স্থান, অস্ত্র ও সৈন্যসংখ্যার ভিত্তিতে পরিবর্তিত হয়। তাই যুদ্ধের স্ট্রাটেজিগুলো সর্ববস্থায় একই থাকে, যা কোন যুদ্ধেই পরিবর্তন করা যায় না। কিন্তু ট্যাকটিকগুলো সময়, স্থান, শত্রু, অস্ত্র, বাস্তবতা, আবহাওয়া, সহ পারিপার্শিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তিত হয়। যেমন ফিকহের ক্ষেত্রে কিছু হচ্ছে
উসুল বা মূলনীতি যা কখনো পরিবর্তিত হয় না, কিন্তু মাসায়ালা অবস্থাভেধে পরিবর্তিত হয়। যেমন একজনের জন্যে দাড়ি কাটা জায়েয না হলেও আরেকজনের জন্যে
জীবন রক্ষা বা গ্রেফতারী থেকে বাঁচার জন্যে দাড়ি কাটা ওয়াজিব। তাই পরিস্থিতির দিকে দৃষ্টি রাখুন

3 কার্ল ফন ক্লাউসউইটস ছিলেন একজন প্রুশিয়ান জেনারেল ও সামরিক তাত্ত্বিক, যিনি যুদ্ধের মনস্তাত্ত্বিক এবং রাজনৈতিক দিকসমূহের উপর জোর দিয়েছিলেন। তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদানছিল সামরিক ও মিলিটারি স্ট্রাটেজির উপর লিখিত বই Vom Kriege (On War) যা তিনি অসমাপ্ত রেখে মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

অতঃপর এই পরিস্থিতিতে যা উপযুক্ত সেই হিসেবে সম্মুখে অগ্রসর হোন, এটাই হলো ট্যাকটিক। আর স্ট্র্যাটেজিক হলো এমন কৌশল যার মধ্যে কোন পরিবর্তন হয় না।

আমরা পূর্বের কথায় ফিরে আসি, সর্ব প্রথম সামরিক বিজ্ঞান লিপিবদ্ধ করেছেন কম্যান্ডারক্লাউসউইটস(carl von clausewitz)।তিনিThe Book of War, Principles of War ইত্যাদি যুদ্ধবিদ্যা নিয়ে ৩৮ টি বই লিখেছেন,যা বাজারে পাওয়া যায়। মুজাহিদ ভাইদের লাইব্রেরীতেও পাবেন। কিন্তু এই সবগুলোতে শৃঙ্খলাবদ্ধ সেনাবাহিনীর স্ট্রেটেজি ও যুদ্ধের কৌশল নিয়ে আলোচনা হয়েছে। যদিও গেরিলাদের এগুলো প্রয়োজন নেই, তবু সে এগুলো শত্রুর কৌশল সম্পর্কে জানার জন্যে অধ্যয়ন করবে। আমি এই কিতাবগুলোর অনেক অংশ পাঠ করেছি এবং লক্ষ করলাম এখানের অধিকাংশ নীতিমালা হচ্ছে তাই, যে সমস্ত কৌশলগুলোকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রয়োগ করেছিলেন, খালিদ ইবনে ওয়ালিদ

4

, আমর ইবনুল আস

5 ও আবু

4 খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ (৫৮৫–৬৪২) ছিলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একজন সাহাবি। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার উত্তরসূরি খলিফা আবু বকর ও উমরের অধীনে সামরিক নেতৃত্বদান এবং নিজস্ব রণকৌশলের জন্য তিনি খ্যাত।[১] খিলাফতের সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে থাকাবস্থায় খালিদ একশটিরও বেশি যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছেন। এসকল যুদ্ধ বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য, সাসানীয় সাম্রাজ্য, তাদের মিত্র এবং অন্যান্য আরব গোত্রসমূহের বিরুদ্ধে সংঘটিত হয়েছে। তার কৌশলগত অর্জনের মধ্যে রয়েছে রিদ্দার যুদ্ধের সময় আরব উপদ্বীপকে ঐক্যবদ্ধকরণ এবং ৬৩২ থেকে ৬৩৬ সালের মধ্যে পার্সিয়ান মেসোপটেমিয়া এবং রোমান সিরিয়া বিজয়। ইয়ামামা, উলাইস, ফিরাজে তার ফলাফল নির্ধারণী বিজয় এবং ওয়ালাজা ও ইয়ারমুকে তার কৌশলগত সাফল্যের জন্যও তাকে স্মরণ করা হয়।

5 রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবী;আমর ইবনে আল আস ছিলেন আরব সেনাবাহিনীর একজন সেনাপ্রধান, যিনি ৬৪০ খ্রিষ্টাব্দে মিশরে মুসলিম বিজয়ের জন্য সর্বাধিক পরিচিত| তিনি মিশরীয় রাজধানী "ফুসতাতের"গোড়াপত্তন করেন এবং এর কেন্দ্রে বিখ্যাত আমর ইবনে আস মসজিদ নির্মাণ করেন|

উবাইদা ইবনুল জাররাহ [6]রাদিয়াল্লাহু আনহুম শাম , মিসর ও ইরাক বিজয়ের অবলম্বন করেছিলেন।

আজ তারা যে কৌশলগুলো নিয়ে আলোচনা করছে তা যে পূর্ববর্তীদের নিকট ছিল , হয়তো সে জানে না অথবা জানলেও তা গোপন করেছে , যেমনটা জার্মানির সামরিক ডিপার্টমেন্টগুলোর অবস্থা। সেখানে খালিদ বিন ওয়ালিদ এর যুদ্ধ কৌশল শিক্ষা দেওয়া হয় , হয়তো তারা জানে অথবা জানেনা , আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন। কিন্তু মূল বিষয় হল, মুসলমানদের কাছে সামরিক বিদ্যার বিশাল ভাণ্ডার রয়েছে। যদি তারা আল্লাহর নবীর কৌশল , আক্রমণ , যুদ্ধ পদ্ধতি ও ভাগ বন্টন থেকে তা বের করতে সক্ষম হয়। আর এটা একজন সামরিক বিশেষজ্ঞের জন্যে সম্ভব একটি বিষয় , এখান থেকে অনেক কিছু বের করে নিয়ে আসা।

উদাহরণস্বরূপ ; যুদ্ধের ময়দানে সৈন্যদেরকে সারিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে আল্লাহর নবীর কৌশল নিয়ে আলোচনা করতে চাও তাহলে দেখতে পাবে , তিনি ওহুদ যুদ্ধে যখন কুফফারদেরকে প্রতিরোধের জন্য মদীনা থেকে বের হলেন এবং যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত হলেন। তখন তিনি শত্রুকে তার এবং মদিনার মাঝে রাখলেন। এই কৌশলের দিকে লক্ষ কর , তিনি মদিনাকে প্রতিরোধ করতে চাচ্ছেন কিন্তু শত্রুকে উনার এবং মদিনার মাঝে রাখছেন। আল্লাহর নবী কাছে ওহুদ পাহাড় মদিনা থেকেও গুরুত্বপূর্ণ ছিল , তিনি পিঠকে মদীনার দিকে না দিয়ে ওহুদ পাহাড়ের দিকে দিয়েছিলেন এবং মদীনাকে প্রতিরক্ষা করছিলেন। কারণ আল্লাহ নবী জানতেন মানুষের স্বাভাবিক অভ্যাস অনুযায়ী কুরাইশ বাহিনীর পক্ষে এটা কখনোই সম্ভব হবে না যে , তারা আল্লাহ নবীকে পিছনে রেখে মদীনার দিকে অগ্রসর হবে। শত্রুর পক্ষে এটা চিন্তা করাও সম্ভব না। এটা মানুষের স্বভাবজাত জিনিস। আমি আমার শত্রুকে পিছনে রেখে তার শহরের দিকে অভিমুখী হব অথচ

---

6 আবু উবাইদা আমর ইবনে আবদিল্লাহ ইবনুল জাররাহ (৫৮১-৬৩৮) (আরবি: أبو عبيدة عامر بن عبدالله بن الجراح) আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ বলে অধিক পরিচিত , তিনি ছিলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একজন সাহাবী। খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাবের সময় তিনি রাশিদুন সেনাবাহিনীর একজন সেনাপতি ছিলেন।

মাঝে এমন ফাঁকা জায়গা রয়েছে যেখানে তার পক্ষে আমাকে ধরে ফেলা সম্ভব!!! এটা কখনোই হবে না। তাই আল্লাহ নবী পাহাড়কে তার পিঠের দিকে দিলেন এবং মদিনাকে সামনে রাখলেন। যখন শত্রু তাঁরএবং মদিনায় মাঝে অবস্থান করল তখন আল্লাহর নবী সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান জাবালে রুমা’য় আরোহন করলেন এবং কিছু সাহাবীকে বললেনঃ ‘তোমরা এই স্থানটা ছেড়ো না যদিও দেখো পাখি আমাদের মৃত লাশ গুলোর উপর উড়াউড়ি করছে’।

এটা আল্লাহ নবীর অনেকগুলো কৌশলের মধ্যে একটি কৌশল। চিন্তা করলে বুঝবে সামরিক বিদ্যা ও কৌশলগুলো সব মুসলিমদের কাছে ছিল, আল্লাহর নবীর কাছে ছিল এবং সাহাবাদের কাছে ছিল। কারণ তারা যখন বিভিন্ন শহর বিজয় করেছেন তারা কি এগুলো এমনিতেই বিজয় করেছেন?

এমনকি আল্লাহ তায়ালাও আমাদের জন্য যুদ্ধের নীতিমালা অবতীর্ণ করেছেন। তিনি বলেছেনঃ আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন যারা তারা পথে সারিবদ্ধ ভাবে যুদ্ধ করে। বলা হয় কোরাইশরা যখন দেখল নবী আলাইহিস সালাম তার সাথীদেরকে যুদ্ধের জন্য সারিবদ্ধ করছেন, তারা এই কাজ এর ফলে আশ্চর্যান্বিত হল এবং এগুলোকে যুদ্ধের অন্তর্ভুক্তই মনে করল না। আল্লাহ তাআলা এমন কিছু কৌশল ও রাস্তা দেখিয়ে দিলেন যার মাধ্যমে শত্রুকে পরাজিত করা সম্ভব। তাই যখন আল্লাহ তাদেরকে সারিবদ্ধ করলেন, এই কাজটা তাদের কাছে গোলমাল মনে হল ও তারা দূর্বল হয়ে গেল এবং এই কৌশলগুলোকে যুদ্ধের অন্তর্ভুক্ত মনে করল না।

তাই গুরুত্বের সাথে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, যুদ্ধের স্ট্র্যাটেজি নবী ও সাহাবাদের কাছে ছিল। পরবর্তীতে কিছু সামরিক জেনারেল এসে এগুলোকে লিপিবদ্ধ করেছেন। যুদ্ধের স্ট্রাটেজি ও আক্রমণের কৌশল লিপিবদ্ধ করেছেন যাতে তাদের আর্মি স্কুলগুলোতে একাডেমিক সিস্টেমে পাঠদান করা যায়।

পরবর্তীতে গেরিলা যুদ্ধের নীতিমালাও লিপিবদ্ধ হওয়া

শুরু হয়েছে। ইসলাম পূর্ব যুগেও আরবরা শত্রুর বিরুদ্ধে

বিভিন্ন গেরিলা কলাকৌশল প্রয়োগ করেছিল, পরে ইসলাম এসে

অতর্কিত আক্রমণ, উৎ পেতে থাকা ইত্যাদি বিভিন্ন

ক্ষেত্রে গেরিলা নীতিমালা ব্যবহার করছিল।

পরবর্তীতে কমিউনিস্ট বিপ্লবের

7 সময় যখন তারা চীনা
জাতির সাথে যুদ্ধ করে ও বিজয় অর্জিত হয় এবং চীনকে

কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে পরিণত করতে সক্ষম হয়। তখন জেনারেল

মাও জিডং

8 যুদ্ধে ব্যবহৃত গেরিলা যুদ্ধের কৌশলগুলোকে লিপিবদ্ধ করে এবং সেই সর্বপ্রথম গেরিলা যুদ্ধের

নীতিমালা লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ।

পরবর্তীতে ভিয়েতনাম যুদ্ধের নেতারা এই কাজটা করেছিল।

প্রথমে তারা ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দেশ

থেকে হটিয়ে দিতে সক্ষম হয়। পরবর্তীতে আবার

আমেরিকানদের সাথে যুদ্ধ লাগে এবং তাতেও তারা একই কৌশল

অবলম্বন করেন। তারা গেরিলাযুদ্ধকে একটি শাস্ত্রে রূপ

দিতে সক্ষম হয়। তারা এখানে অনেক স্ট্র্যাটেজি ও

টেকনিক আবিষ্কার করে। এরপর কিউবার প্রেসিডেন্ট ফিদেল

7 সাম্যবাদী বিপ্লব বা কমিউনিস্ট বিপ্লব (ইংরেজি: Communist revolution) হলো "মার্কসবাদী ধারণার” দ্বারা অনুপ্রাণিত একটি "প্রলেতারীয় বিপ্লব", যার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হলো প্রচলিত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে কমিউনিজম এবং সমাজতন্ত্র (অর্থাৎ রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত উৎপাদন ব্যবস্থা) প্রতিষ্ঠা করা। মার্কসবাদী বিশ্বাস অনুসারে সমগ্র বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীকে একত্রিত হয়ে নিজেদের পুঁজিবাদী শোষণের হাত থেকে মুক্ত করতে হবে যাতে শ্রমিকশ্রেণীর দ্বারা পরিচালিত একটি বিশ্ব গড়ে তোলা
সম্ভব হয়। লেনিনবাদ এই যুক্তি দেখায় যে, সাম্যবাদের প্রলেতারীয় চরিত্রের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার মধ্যে। এই কমিউনিস্ট পার্টি বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের সংগে স্বতঃস্ফূর্ত শ্রমিক আন্দোলনের মিলন ঘটিয়েছে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সমাজবিপ্লবের ধরনগুলো চিহ্নিত করেছে এবং দেখিয়েছে যে প্রলেতারিয়েতের ভ্যানগার্ড পার্টি বা অগ্রবর্তী বাহিনী দ্বারা পরিচালিত কমিউনিস্ট বিপ্লব বস্তুত সর্বোচ্চ ধরনের সমাজবিপ্লব এবং পূর্বোক্ত সকল বিপ্লব থেকে মূলগতভাবে পৃথক। এই
বিপ্লব হচ্ছে চিরাচরিত সম্পত্তি সম্পর্কের সংগে একেবারে আমূল বিচ্ছেদ।

8 মাও ৎসে-তুং বা মাও সেতুং বা মাও জেদং (Mao Zedong) (জন্ম- ডিসেম্বর ২৬, ১৮৯৩; মৃত্যু- সেপ্টেম্বর ৯, ১৯৭৬) চীনা বিপ্লবী মার্কসবাদী তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক নেতা। ১৯৪৯ সালে সমাজতন্ত্রী চীনের প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯৭৬ সালে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি চীন শাসন করেন। তিনি চীনের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন এবং নেতা ছিলেন। মার্কসবাদ-লেনিনবাদে তার তাত্ত্বিক অবদান, সমর কৌশল এবং তার কমিউনিজমের নীতি এখন একত্রে মাওবাদ নামে পরিচিত।

কাস্ত্রো

9 এবং আর্জেন্টিনার গেরিলা ‘চে গুয়েভারা

10’

কমিউনিস্ট আন্দোলন শুরু করে। যখন তারা যুদ্ধ শুরু করেন তখন মাত্র ১৩ জন লোক ছিল। আস্তে আস্তে তারা কিউবা দখল করে নেয় এবং আজও পর্যন্ত আমেরিকার গলার কাঁটা হিসেবে টিকে আছে।

মূলকথা হলো গেরিলাযুদ্ধ লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে ও এখানে অনেক অভিজ্ঞতা সংযুক্ত হচ্ছে। পূর্বের যুদ্ধগুলো থেকেও অনেক স্ট্রাটেজি আবিষ্কৃত হচ্ছে। এই বইয়ে সব স্ট্রাটেজি নিয়ে কথা দীর্ঘ করবো না কারণ অনেকগুলোতে আলাদা আলোচনা দরকার। তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো
আলোচনা করবো। গেরিলা যুদ্ধ অথবা গেরিলা যোদ্ধারা
কিভাবে বিভক্ত হবে, তাদের বিন্যাস কাঠামো, কিভাবে তারা আক্রমণ পরিচালনা করবে এবং আক্রমণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ স্ট্রাটেজি গুলো কি, গেরিলা যুদ্ধের স্তরগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গুলো জানবো ইনশাআল্লাহ্‌।

শুরুতে যখন গেরিলা যুদ্ধের নীতিমালা লিপিবদ্ধ হচ্ছিল
তখন বিভিন্ন স্থান থেকে বিক্ষিপ্তভাবে কৌশল ও অভিজ্ঞতা জমা করা হচ্ছিল। আস্তে আস্তে তা এমন একটি পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে যেখানে সেই সব নীতিমালায় লিপিবদ্ধ

9 ফিদেল কাস্ত্রো কিউবান বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসেন যা যুক্তরাষ্ট্রের মদদে চলা বাতিস্তার স্বৈরশাসনকে ক্ষমতাচ্যুত করে। ১৯৬৫ সালে তিনি কিউবা কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান হন এবং কিউবাকে একদলীয় সমজতান্ত্রিক দেশ হিসেবে রূপ দেন।

10 তরুণ বয়সে ডাক্তারি ছাত্র হিসেবে চে সমগ্র লাতিন আমেরিকা ভ্রমণ করেছিলেন। এই সময় এই সব অঞ্চলের সর্বব্যাপী দারিদ্র্য তার মনে গভীর রেখাপাত করে। এই ভ্রমণকালে তার অর্জিত অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে এই অঞ্চলে বদ্ধমূল অর্থনৈতিক বৈষম্যের স্বাভাবিক কারণ হল একচেটিয়া পুঁজিবাদ, নব্য ঔপনিবেশিকতাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ; এবং এর একমাত্র সমাধান হল বিশ্ব বিপ্লব। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে চে রাষ্ট্রপতি জাকোবো আরবেনজ গুজমানের নেতৃত্বাধীন গুয়াতেমালার সামাজিক সংস্কার আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৫৪ সালে সিআইএ-এর ষড়যন্ত্রে গুজমানকে ক্ষমতাচ্যুত করা হলে চে-র বৈপ্লবিক আদর্শ চেতনা বদ্ধমূল হয়। পরবর্তীকালে মেক্সিকো সিটিতে বসবাসের সময় তার সঙ্গে রাউল ও ফিদেল কাস্ত্রোর আলাপ হয়। চে তাঁদের "ছাব্বিশে জুলাই আন্দোলনে” যোগ দেন। মার্কিন-মদতপুষ্ট কিউবান একনায়ক ফুলগেনসিও বাতিস্তা উৎখাত করার জন্য নৌকায় চড়ে সমুদ্রপথে কিউবায় প্রবেশ করেন। অনতিবিলম্বেই চে বিপ্লবী সংঘের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। সেকেন্ড-ইন-কম্যান্ড পদে তার পদোন্নতি হয় এবং বাতিস্তা সরকারকে উত্খাত করার লক্ষ্যে দুই বছর ধরে চলা গেরিলা সংগ্রামের সাফল্যের ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

হয়েছে যা অধিক কার্যকরী ও সফল। যেমন আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি গেরিলা যুদ্ধের সর্বোত্তম স্থান ও সেগুলোর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে। শহর, পাহাড়, জঙ্গল ও মরুভূমি।

গেরিলা যুদ্ধের বিন্যাস কাঠামো

গেরিলা যোদ্ধাদের জন্য সমস্যার জায়গা শুধু একটাই, আর তা হল গেরিলা যোদ্ধারা এমন বাহিনী হবে যা পদাতিক। এবং যদি সে দক্ষতার সাথে যুদ্ধ করতে চায় তাহলে সামরিক সমস্ত কিছু জ্ঞান অর্জন করতে হবে। অর্থাৎ সামরিক সব দক্ষতা তার থাকতে হবে। একজন গেরিলাকে অবশ্যই যোদ্ধা হতে হবে, সিগন্যাল কর্পস, প্রকৌশল, অন্যদের সাথে যোগাযোগ মাধ্যমগুলো ব্যবহারের দক্ষতা থাকতে হবে এবং উদ্ধার কাজে দক্ষতা থাকতে হবে। অর্থাৎ যুদ্ধের ময়দানে সবগুলো প্রয়োজনীয় জ্ঞান তার একার মধ্যেই থাকতে হবে। এমনকি যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আকাশ ও সমুদ্র যুদ্ধের দক্ষতাও থাকতে হবে। তাই গেরিলা যুদ্ধের কষ্টকর কাজ হচ্ছে তাদের প্রত্যেককেই এই সবকিছুতে যোগ্য করে গড়ে তোলা আবশ্যক। এমনকি ট্যাংক, কামান ও বিমান প্রতিরোধের দক্ষতা থাকতে হবে। অর্থাৎ স্বাভাবিক সেনা বাহিনী যুদ্ধের বিভিন্ন প্রয়োজনের জন্য বিভিন্ন ধরনের লোক ব্যবহার করলেও গেরিলা যোদ্ধার জন্য একাই সব ধরনের যোগ্যতার অধিকারী হওয়া আবশ্যক।

সুতরাং একজন গেরিলা কমান্ডো যার এসমস্ত দক্ষতা রয়েছে এবং সামরিক বিদ্যার সবকিছুই সে জানে, তখন তার থেকে সর্বোচ্চ ফায়দা নেওয়া সম্ভব। কারণ তুমি যখন গেরিলা যোদ্ধায় পরিণত হয়েছে, যুদ্ধের সমস্ত বিদ্যা সম্পর্কে অবগত, তখন তোমার কৌশল সফলতার ব্যাপারে অনেকটাই নিশ্চিত। আর গেরিলা যোদ্ধাদের কৌশলগুলো হয়ে থাকে উন্মুক্ত। আমার কাছে যদি তিনজন গেরিলা থাকে তাহলে তাদের থেকে উপকৃত হতে পারবো, একজন থাকলেও উপকৃত হতে পারব। দশজন বা বিশজন সবার থেকেই উপকৃত হতে পারব।

কিন্তু গতানুগতিক শৃংখলাবদ্ধ সেনাদের মধ্য থেকে১০ জন নিয়ে আসলেও তাদের থেকে উপকৃত হওয়া সম্ভব না, কারণ হয়তো এই দশজন হচ্ছে পদাতিক। এখন তারা যদি নেভিগেশন যন্ত্র হারিয়ে ফেলে তাহলে তাদের দ্বারা কোন উপকার হওয়া সম্ভব না, যোগাযোগের দক্ষ ব্যক্তিকে হারিয়ে ফেলেছে তো তাদের মধ্যে আর কোন উপকার নেই। তেমনি কোন আবশ্যকীয় জিনিস হারিয়ে ফেললে তারা অকেজো হয়ে যাবে। এমনকি ট্যাংক যুদ্ধে যদি এর নিক্ষেপকারী নিহত হয় তাহলে বাকিদের দ্বারা কোন ফায়দা নেই, ঠিক তেমনি এর চালক যদি নিহত হয় তাহলে কোন ফায়দা নেই। কামানের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। কারণ শৃংখলাবদ্ধ সেনাবাহিনী সামষ্টিকভাবে কাজ করে থাকে। তারা এমন দল যেখানে একজন অপরজনকে পরিপূর্ণ করে।

তারা বাহিনীতে কোন ব্যক্তিকে নিয়ে আসে এবং তাকে তার অস্ত্রের বিষয়ে অভিজ্ঞ করে তোলে। যেমন কাউকে হালকা অস্ত্রের প্রশিক্ষণ দিয়ে ১০০%অভিজ্ঞ করে তুললো। কিন্তু অন্যদিকে একজন গেরিলা যোদ্ধার জন্য একই সময়ে হালকা, মধ্যম ও ভারী সমস্ত অস্ত্রের দক্ষতা থাকতে হবে। সেই সাথে বোমা তৈরি, বিভিন্ন যুদ্ধযান ও যানবাহনগুলোকে পরিচালনা অর্থাৎ সমস্ত বিষয়ে দক্ষতা থাকতে হবে। ট্যাংক পরিচালনা, নিক্ষেপ করা এবং যেকোন জায়গায় প্রবেশ করানো অর্থাৎ তার একার পক্ষেই সবগুলো কাজ করার সক্ষমতা থাকতে হবে, যাতে করে একাই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। অর্থাৎ সে যুদ্ধের সমস্ত কৌশল জানবে, প্রয়োগ করতে পারবে এবং যুদ্ধের যে কোনো পর্যায়ে, যে কোনো পরিস্থিতিতে, যে কোনো স্থানে, যে কোনো আক্রমণ পরিচালনা করতে পারবে। যদি তুমি গেরিলাদেরকে এভাবে প্রস্তুত করো তাহলে তোমার সামনে যুদ্ধের পরিকল্পনাগুলো সহজ ও উম্মুক্ত হয়ে যাবে।

পাহাড় ও জঙ্গলে গেরিলা যোদ্ধাদের সর্বোত্তম ইউনিট হচ্ছে ২৫ জন। এদের মধ্যে থাকবে আমীর, সহকারী, কমান্ডার, একজন বা দুইজন রাস্তা নিরূপণকারী, এক বা দুইজন

স্নাইপার, দুইজন যুদ্ধযান পরিচালনাকারী, দুইজন উদ্ধারকর্মী, ছয় থেকে আট জন যোদ্ধা। এখানে সবাই যদিও প্রত্যেকটা কাজে ভালো পারে, তারপরও যুদ্ধে কিছুটা শৃংখলাবদ্ধ আক্রমণের জন্য এই ধরনের বিন্যাস হবে সর্বোত্তম কাঠামো। এখন তোমার কাছে যদি 10 জন থাকে তাহলেও এই ধরনের বিন্যাস করতে পারবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এই বিন্যাসের ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতি মুখাপেক্ষী নও, বরং পরিস্থিতি অনুযায়ী বিন্যাস পরিবর্তন আবশ্যক।

যদি তুমি এমন যুদ্ধে প্রবেশ করো যেখানে শত্রুর সামরিক যান বেশি তাহলে তোমার অধিকাংশ সদস্য ট্যাংক বিধ্বংসী অস্ত্র বহন করবে। যদি তুমি এমন যুদ্ধে অবতীর্ণ হও যেখানে কোন সামরিক ঘাঁটি ধ্বংস করতে হবে, তাহলে তোমার অধিকাংশ অথবা সমস্ত সাথীর নিকট হ্যান্ড গ্রেনেডের অনেক মজুদ থাকতে হবে। যাতে রাস্তা, পরীখা তথা বাংকার বা বিভিন্ন কক্ষগুলোকে ধ্বংস করা যায়। তাই তোমার সামনের কাজের ভিত্তিতে এবং যুদ্ধের পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে এই দলটাকে বিন্যাস করতে হবে। সুতরাং যেহেতু বিন্যাস কাঠামো উম্মুক্ত এবং সবার সব ধরনের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাই গেরিলা যোদ্ধাদের কোন কিছুর ঘাটতি হয় না।

অন্যদিকে গতানুগতিক সেনাবাহিনীকে দেখবে তারা নির্দিষ্ট সিস্টেমে সংযুক্ত হয় এবং একে অপরের সাথে মিলিত থাকে। কিন্তু গেরিলা যোদ্ধাদের কোন নির্দিষ্ট সম্পর্ক বা যোগাযোগ প্রয়োজন নেই, গেরিলা যোদ্ধাদের কোন স্থান সংরক্ষণ করা, নির্দিষ্ট স্থান দিয়ে চলাচলের আবশ্যকীয়তা নেই। বরং তার যেভাবে ইচ্ছা এবং যুদ্ধের জন্য উপযোগী পদ্ধতিতে চলাচল করে। এগুলোই হচ্ছে গেরিলাযুদ্ধের বিন্যাস।

গেরিলা যুদ্ধের প্রথম মারহালা

المرحلة الأولى هي: مرحلة المناوشة أو «الكَر والفَر» أو «الكلب والبرغوث»، لها أسماء كثيرة

প্রথম স্তর , যাকে বলা হয় হিট অ্যান্ড রান ; “আঘাত করো ও পলায়ন করো”। অর্থাৎ খন্ডযুদ্ধের অবস্থা ও শত্রুকে নিশ্বেষ করে দেয়ার যুদ্ধ।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এই যুদ্ধের স্ট্র্যাটেজি হলো, তুমি শত্রুর সামনে প্রকাশিত হবে না। এই ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা বা একগুয়েমি করা গেরিলাদেরকে ধ্বংস করে ফেলবে অর্থাৎ শত্রুকে পরাজিত করার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি বা দুঃসাহসিকতা দেখানো এই স্তরকে নষ্ট করবে। এসময় তুমি নির্দিষ্ট কোন স্থান রক্ষার দায়িত্ব নিবে না এবং নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করবে না। ভারী অস্ত্র এই মারহালার জন্য জন্য উপযুক্ত নয় এবং উপযুক্ত নয় কোন স্থান পাহারাদারি করা। এই সময়ে শত্রুকে আক্রমণের সর্বোত্তম সময় হচ্ছে তার চলাচলের সময় , কারণ শত্রু যখন এক স্থান থেকে অপর স্থানে যাতায়াতের মধ্যে থাকে তখন সে সবচেয়ে দুর্বল থাকে। যখন শত্রু যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকবে তখন তাকে আক্রমণ করবে না।

এই মারহালাতে গেরিলাদের জন্য পলায়নের পদ্ধতি আত্মস্থ করা আবশ্যক। পলায়নের সব ধরনের জ্ঞান থাকতে হবে এবং এটাকে তাদের সর্বাধিক গুরুত্বের স্থানে রাখতে হবে। পলায়নে দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে , আক্রমণ করে ফিরে আসা। শত্রু সম্মুখ থেকে দ্রুত সরে যাওয়া। এজন্যই মাও জিডং বলেছিলো; তুমি শিক্ষা নাও কিভাবে পলায়ন করবে। আসলেই কিভাবে পলায়ন করবে তার শিক্ষা গ্রহণ করা আবশ্যক। শত্রুকে কখনই সামনে থেকে আক্রমন করবে না বরং তোমার উপর আবশ্যক হচ্ছে , তার পিছনে আক্রমণ করা , তার রসদে আক্রমণ করা, সরবরাহ লাইনে আক্রমণ করা এবং দুর্বল পয়েন্ট আক্রমণ করা।

চেষ্টা করবে শত্রুকে যতটা সম্ভব বিস্তৃত অঞ্চলে ছড়িয়ে দিতে। এক্ষেত্রে গেরিলাদের জন্য উত্তম হবে চারটি ভিন্ন স্থানে আক্রমণ করা যা একটা আরেকটি থেকে অনেক দূর হবে। অথবা সম্ভব হলে আটটি বিচ্ছিন্ন স্থানে আক্রমণ করা। এখানে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করার দ্বারা গেরিলাদের শত্রু সেনা হত্যা উদ্দেশ্যে থাকবে না বরং উদ্দেশ্য হবে শত্রুর শক্তি -সক্ষমতাকে আস্তে আস্তে নিঃশেষ করে ফেলা। উদাহরণত , যখন আমরা বলি একটা ‘সারিয়্যাহ ’৫০ বর্গ কিলোমিটারের মধ্যে কাজ করে। এখন যখন তুমি ৫০ কিলোমিটারের মধ্যে আক্রমণ করবে তখন তারা এই অঞ্চলের মধ্যে ছড়াবে , পরবর্তীতে তোমার আক্রমণটা পূর্বের আক্রমণ থেকে ১০০ কিলোমিটারের মধ্যে ছড়িয়ে দিবে। এর পরবর্তীতে আক্রমণ বিস্তৃত করে অন্য কোন সারিয়্যাহ বা কাতিবার অঞ্চলে চলে যাবে। সুতরাং তোমার জন্য প্রয়োজন শত্রুকে যতটুকু সম্ভব ছড়িয়ে দেওয়া।
এই ছড়িয়ে দেওয়ার অর্থ হচ্ছে শত্রুকে ক্ষয় করে ফেলা শত্রুকে শক্তিকে নিঃশেষ করে ফেলা।
তাই এই স্তরটাকে "حرب الإستنزاف"‘ নিঃশেষের যুদ্ধ ’ নামকরণ করা হয়।

অনেকে এটার নাম রেখেছে “কুকুর ও পোকা ”। কুকুর অবশ্যই আটালি পোকা থেকে অধিক শক্তিশালী। কিন্তু পোকার পক্ষে সম্ভব কুকুরকে ক্লান্ত করে ফেলা এবং তার সমস্ত শক্তিকে নিঃশেষ করে ফেলা। তুমি দেখবে পোকা তার এক জায়গায় কামড় দেয় তখন কুকুর সে জায়গাটা নখ দিয়ে আঁচড়ায় , পরে সে ভিন্ন স্থানে চলে যায় এবং কামড় বসায় ফলে কুকুর সেই আরেকটা স্থানে আচড়ায়। এভাবে এসে কামড় দিতে থাকে আর কুকুর প্রত্যেকটা স্থানে আচঁড়াতে থাকে। ফলে কুকুরকে দেখবে সে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত , চামড়ায় আচড় কাটছে অর্থাৎ সে অন্য কিছুকে আচড়াচ্ছে না। এবং পোকা তার শরীর থেকে রক্ত খাওয়ার সাথে সাথে সে নিজেও নখ দিয়ে চামড়া থেকে রক্ত বের করছে , সে নিজেকে কষ্ট দিচ্ছে। সুতরাং তোমাকেও এই পদ্ধতিতে শত্রুকে নিঃশেষ

করে ফেলতে হবে। অথচ যদি পোকা কুকুরের সামনে দাঁড়াত তাহলে এক থাবায় শেষ করে ফেলত।

তাই তোমার উচিত সেই একই পদ্ধতি অনুসরণ করা শত্রুকে যুদ্ধের মাঠ থেকে বের করে দেয়া, হত্যা করা নয়।১০০ কিলোমিটারের চারটা বিচ্ছিন্ন স্থানে আক্রমণ করে ১০০ জন সেনাকে হত্যা করা তোমার জন্য উত্তম, নিকটবর্তী স্থানে ৮ টি আক্রমণ করে ৩০০ জন হত্যা করার চেয়ে। কেননা এই স্তরে প্রয়োজন হল শত্রুর সমস্ত শক্তি ব্যস্ত রাখা এবং সমস্ত সক্ষমতা নিঃশেষ করে ফেলা। কেননা তুমি তার জন্য কোনো নিরাপদ স্থান রাখতে চাও না।

যদি তুমি কোন রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে দাড়াও, তাহলে তোমার জন্য ভুল হবে কোন একটা নির্দিষ্ট অঞ্চল দখল করা। কারণ তখন শত্রু তার সমস্ত শক্তি নিয়ে সে অঞ্চলকে উদ্ধার করতে সক্ষম হবে। বরং উত্তম হবে শত্রুকে পুরা দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে দেওয়া এবং আক্রমণ করা। কারণ সে যখন ছড়িয়ে পড়বে, দুর্বল হয়ে যাবে। গেরিলাদের সামনে যেই পরিস্থিতি আসুক, শৃংখলাবদ্ধ সেনাবাহিনী যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তাহলে দুর্বল হয়ে পড়ে। এবং তাদের পক্ষে তোমার আক্রমনকে প্রতিহত করার মতো শক্তি একত্র করা সম্ভব হবে না।

উদাহরণতঃ আমেরিকানরা যদি আফগানিস্থানে ‘পাকতিয়া’ প্রদেশে গেরিলাদের যুদ্ধ বন্ধ করতে চায়, তাহলে তাদের এক মিলিয়নের অধিক সৈন্য লাগবে। কারণ তখন তাদের পরিপূর্ণ প্রস্তুতি ও নিরাপদ সরবরাহ লাইন লাগবে, যাতে সফলভাবে গেরিলাদের ওপর আক্রমণ করা যায়। কারণ শত্রু যদি কোন ডিভিশনকে ২০০ কিলোমিটার দূরে পাঠায়, তাহলে তার জন্য আবশ্যক হলো ২০০ কিলোমিটার এর মধ্যে সেনা ছড়িয়ে দেওয়া এবং পূর্ণ রাস্তা পাহারাদারি করা। তাই শত্রু যত বিচ্ছিন্ন হবে সে তত দ্রুত নিঃশ্বাস হবে।

শত্রু স্বাভাবিক ভাবে নিহত যতই হোক; তা সহ্য করে নিতে পারে। যেমন আমেরিকার জনগণ ৩০০ মিলিয়ন। তুমি যদি এখান থেকে ১ মিলিয়নকে আফগানিস্তানে হত্যা করো, তাহলে এটা কি তাদের ওপর কোনো প্রভাব ফেলবে? জনসংখ্যার দিক থেকে এটা কোনো প্রভাব ফেলবে না। কিন্তু তোমার পক্ষে সম্ভব মিলিয়নকে হত্যা না করে তাদের শক্তি ও সক্ষমতাকে নিঃশেষ করে ফেলা। উদাহরণস্বরূপ ভিয়েতনাম যুদ্ধে আমেরিকান সেনা মারা গেছে ৭৬০০০, অন্যদিকে ভিয়েতনামি জনগণ মারা গেছে চার মিলিয়ন। কিন্তু আমেরিকাই পরাজয় ঘোষণা করেছে। তাই শত্রুকে সেনা ও অস্ত্র ধ্বংস করে পরাজিত করা সম্ভব নয় বরং এটা পরাজয়ের একটি অংশ। আসল পরাজয় হচ্ছে শত্রুর যুদ্ধের ইচ্ছাকে নষ্ট করে দেয়া। আমেরিকানদের ৭৬০০০ নিহতের মাধ্যমে ভিয়েতনামীরা তাদের যুদ্ধের ইচ্ছাকে নষ্ট করে দিয়েছিল।

ঠিক তেমনি আফগানে সেভিয়েত ইউনিয়নের এত বেশি সেনা মারা যায়নি এবং এত অস্ত্র ধ্বংস হয়নি। রাশিয়ার ৪ মিলিয়ন সেনা রয়েছে, এখান থেকে ১ মিলিয়ন আফগানিস্থানে হত্যা করলে তাদের ওপর কোনো প্রভাব ফেলবে না। আফগান যুদ্ধে জনগণ মারা গেছে প্রায় ১৫ লক্ষ, অন্যদিকে সেভিয়েত ইউনিয়নের সেনা নিহত প্রায় ৫০০০০। কিন্তু তারপরেও তারাই পরাজিত হয়েছে। তারাই মুজাহিদদের সাথে চুক্তি করেছে তারা সবকিছু ছেড়ে চলে যাবে, শর্ত হচ্ছে চলে যাওয়ার সময় মুজাহিদরা আক্রমণ করবে না।

সুতরাং তুমি দেখবে যাদের ১৫ লক্ষ নিহত হয়েছে তারাই বিজয়ী, অন্যদিকে অনেক অল্প নিহত হওয়ার পরেও শত্রু পরাজিত। কারণ তুমি শত্রুর যুদ্ধের ইচ্ছা ও আগ্রহকে নষ্ট করে দিয়েছ।
এজন্য কিছু সেনাবাহিনীকে দেখবে তাদের কোনো ক্ষতি ছাড়াই পরাজয় বরণ করে নিচ্ছে। যেমন ইরাকি সেনারা দ্বিতীয় উপসাগরীয় যুদ্ধে

11 পরাজিত হয়েছিল, অথচ
11 পারস্য উপসাগরীয় যুদ্ধের সূচনা ২রা আগস্ট, ১৯৯০ সালে। ১৯৯১ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি এর আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটে। অপারেশন ডেজার্ট স্টর্ম নামে সমধিক পরিচিত এই যুদ্ধের

তাদের ওপর বিমান ও সামুদ্রিক আক্রমণের ফলে মাত্র ১৫ শতাংশ শক্তি নষ্ট হয়েছিল। তাই অনেক সময় শত্রুবাহিনী কোন ক্ষতি বা ধ্বংসে পতিত হওয়া ছাড়াই পরাজয় ঘোষণা করে দেয়। অন্যদিকে এমন বাহিনী আছে যার পূর্ণ শক্তি নষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও নতুন করে ফিরে আসে এবং যুদ্ধ করে বিজয় অর্জন করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশদের সমস্ত শক্তি নষ্ট হয়ে যায়, ফলে বৃটেনের প্রেসিডেন্ট উইনস্টন চার্চিল মানুষের মধ্যে ঘোষণা করেছিল যাতে ঘরের ডেগ-কলসি নিয়ে কারখানায় আসে, যাতে এগুলো দিয়ে যুদ্ধ বিমান তৈরি করা যায়। এবং বাস্তবেই তারা ডেকচির লোহা থেকে বিমান তৈরি করে যুদ্ধ শুরু করে এবং বিজয় অর্জন করে।

ঠিক তেমনি তালেবানদের সমস্ত ভূমি হস্তচ্যুত হয়ে যায়। তাদেরকে সব অঞ্চল থেকে বের করে দেওয়া হয়, কিন্তু আমেরিকানরা তালেবানদেরকে পরাজিত করতে পারে নি। তারা তাদের সমস্ত ভূমি দখল করে ফেলেছিল, তাদের প্রত্যেকটা ঘাঁটিতে আক্রমণ করেছিল এবং বিমানের মাধ্যমে এত ভয়াবহ হামলা করেছিল, যা ইতিহাসে পূর্বে কখনো ঘটেনি। কিন্তু তালেবানরা পরাজিত হয়নি বরং তারা ফিরে গিয়েছিল এমন ভূমি ও কৌশলের খুঁজে, যা দিয়ে তারা শত্রুকে প্রতিরোধ করতে পারবে।

সুতরাং ন্যাটো জোট তালেবানকে পরাজিত করতে পারেনি এবং আফগানদেরকে বাস্তবিক পরাজয় বরন করাতে পারেনি। কেননা পরাজয় হচ্ছে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে শত্রুর আগ্রহকে নষ্ট করে দেয়া এবং এটাই হচ্ছে আসল পরাজয়। আর তালেবানের এই আগ্রহ নষ্ট হয়ে যায়নি যদিও জমিনের বুকে

সংঘটিত হয় ইরাক এবং ৩৪টি দেশের জাতিসংঘ অনুমোদিত যৌথ বাহিনীর মধ্যে। ১৯৯০ সালের আগস্ট মাসে ইরাকের কুয়েত আগ্রাসন এবং কুয়েতি ভূ-খন্ড দখলের প্রেক্ষিতে ইরাকী বাহিনীর হাত থেকে কুয়েতকে মুক্ত করাই ছিল এ যুদ্ধের উদ্দেশ্য। এই যুদ্ধটি আরও কিছু নামে পরিচিত । যেমন: পারস্য উপসাগরীয় যুদ্ধ (Persian Gulf War), প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধ (First Gulf War), কুয়েত যুদ্ধ (Kuwait War) ইত্যাদি। ১৯৯০ সালের ২ আগস্ট ইরাকের সেনাবাহিনী কুয়েত দখল করা শুরু করলে বিভিন্ন দেশ তার নিন্দা জানায়। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ ইরাকের উপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। যুক্তরাস্ট্রের রাষ্ট্রপতি জর্জ এইচ. ডব্লিউ. বুশ সৌদি আরবে সেনা মোতায়েন করেন এবং অন্যান্য রাষ্ট্রগুলোকেও তাদের সেনা পাঠাতে অনুরোধ করেন।

তাদের সবকিছু ধ্বংস হয়ে গেছে। তাই তালেবানরা যখন শহরগুলো ছেড়ে দিয়েছে, তুমি দেখবে শত্রুর ক্ষতি শহরগুলো ছেড়ে দেওয়ার পূর্বের তুলনায় পরে বেশি হচ্ছে। কারণ তখন গেরিলারা আক্রমন করতে পারছে। এজন্যই যে বলবে আমেরিকার সামনে তালেবান পরাজিত হয়েছে, সে সামরিক যুদ্ধের কিছুই বুঝে না। কারণ তাদের মাঝে আর বিজয়ের মাঝে অনেকগুলো ধাপ রয়ে গেছে, আর এখন বিজয় আস্তে আস্তে মুজাহিদদের দিকে ফিরতে শুরু করেছে।

সার্বিক অবস্থায় তুমি এখন প্রথম ধাপে আছো। এখন শত্রুকে হত্যা করার তুলনায় শত্রুকে দুর্বল করে দেওয়া তোমার নিকট অধিক প্রয়োজনীয়। তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া প্রয়োজন, তার মানসিক শক্তিকে ধ্বংস করে দেওয়া প্রয়োজন এবং তোমার জন্য উচিত হবে যতটুকু সম্ভব বিস্তৃত অঞ্চলে থাকে তাদেরকে ছড়িয়ে দেয়া। কারণ তারা যত বেশি ছড়াবে ততবেশী সেনা সাহায্য প্রয়োজন হতেই থাকবে, হতেই থাকবে।

তোমার উপর আবশ্যক এই স্তরটাকে ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া। আক্রমণ করবে, পলায়ন করবে ও গোপন হয়ে যাবে এবং তাদের দূর্বল স্থানে আক্রমণ করবে।
যদি তুমি তোমার শত্রুকে নম্র দেখতে পাও, তাহলে তোমার উপর আবশ্যক তাকে অহংকারী করে তোলা। তুমি শত্রুর সামনে কিছু সময়ের জন্য দুর্বলতা দেখাবে, যাতে সে অহংকারী হয়ে উঠে। এই কাজটাই আফগানিস্থানে আমাদের ভাইয়েরা পরিপূর্ণভাবে প্রয়োগ করতে পেরেছিল। তারা সমস্ত স্থান থেকে বের হয়ে এসেছিল এবং তোরাবোড়াতে অবস্থান নিয়েছিল। তখন মুজাহিদদের শহরগুলো ছেড়ে আসার পরে তারা প্রত্যেকটা অঞ্চলে যাচ্ছিল এবং সেখানে তাদের জন্য বাসস্থান, খাদ্য ও বিভিন্ন সম্পদ পেয়ে যাচ্ছিল। এবং আমেরিকানরা যখন মুজাহিদদেরকে তোরাবোরা থেকেও বের করে দিল, তখন ঈদের পর থেকে জিলহজ পর্যন্ত তারা নিশ্চুপ ছিল। এই সময়ে শত্রুদের বিরুদ্ধে কোনো আক্রমণ পরিচালনা করেনি এবং প্রকাশ্যে কোনো কাজ করে নি। ফলে শত্রুরা

ঘোষণা দিল যে, তাদেরকে পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে। তখন বাস্তবেই অনেক মানুষের মানসিক শক্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং ধারণা শুরু করল আসলেই মুজাহিদরা পরাজিত হয়ে গেছে।

কিন্তু জিলহজের পরেই প্রথম আক্রমণ হয়, যখন শত্রুরা তাদের অহংকার ও দাম্ভিকতায় ডুবেছিল এবং তারা বিভিন্ন স্বপ্ন দেখা শুরু করেছিল। তারা বিভিন্ন ঘোষণা দিচ্ছিল যে, আফগানিস্তানকে পূনর্গঠন করবে এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতিকে ঠিক করবে। তারা খুশিতে এখানে- সেখানে বিজয়ের অনুষ্ঠান করছিল। ঠিক তখন ‘শাহী কোট’ অঞ্চলে সর্বপ্রথম আক্রমণ সংঘটিত হয় এবং শত্রুদেরকে এতটাই ক্ষতিগ্রস্ত করা হয় যা আফগানিস্থানে আক্রমণের পর আমেরিকা প্রত্যক্ষ করেনি। আক্রমণের কমান্ডার বলেছিলেন; আক্রমণে যারা অংশগ্রহণ করেছিল তারা সেই ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত ছিল, যারা (যোগ্যতার দিক থেকে) নাইন ইলেভেন এট্যাক করেছিল। তারা ছিল মৃত্যুর প্রতি প্রচন্ড আগ্রহী। কমান্ডার বলেনঃ তারা সেই পরিমাণ দক্ষ ছিল যেমনটা ছিল সেপ্টেম্বর আক্রমণের সাথীরা। এই যুদ্ধে শত্রু অনেক বিমান ধ্বংস হয়েছিল এবং প্রায় ৪০০ সেনা নিহত হয়েছিল। অন্যদিকে আরব মুজাহিদ শহীদ হয়েছিল ১৪ জন, যদিও আমেরিকা দাবি করেছে ৫০০ বা ৭০০ হত্যা করেছে। আফগানী শহীদ হয়েছেন ৪০ বা ৪২ জন। উজবেকদের মধ্যে বোমা হামলায় শহীদ হয়েছে অল্প কিছু সংখ্যক।

গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, এখানে মুজাহিদরা ১৬০০অহংকারী ন্যাটো সেনার বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করেছিলো। কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, ব্রিটেন সহ ন্যাটোভুক্ত সবগুলোই দেশই যুদ্ধে হত্যার নেশায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল এবং প্রত্যেকেই তার ধ্বংস ও হত্যার হিসাব বুঝে পেয়েছিল।

এবং শাহীকোট আক্রমণের পরে মুজাহিদরা তাদের আক্রমণ ধারাবাহিকভাবে চালাতে শুরু করলো এবং সমস্ত অঞ্চলের

রক্ষার দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া শুরু করে। এই ধারাবাহিক আক্রমণ চলতে চলতে এখন মুজাহিদরা পুনরায় বিশাল শক্তি নিয়ে আফগানিস্তানের মাটিতে ভূমি দখল করা শুরু করেছে।

এ স্তরে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, তুমি সর্বোচ্চ সাধ্য অনুযায়ী এই স্ট্রাটেজিকে বাস্তবায়নের চেষ্টা করবে। অর্থাৎ শত্রু র সামনে প্রকাশিত না হওয়া এবং নির্দিষ্ট কোন ভূখণ্ড দখল না করা, সংরক্ষণ না করা। এটা হচ্ছে গেরিলা যুদ্ধের সবচেয়ে দীর্ঘ মারহালা অর্থাৎ শত্রুকে দূর্বল করে নিঃশেষ করে দেওয়া হয়। এরপরে আসে শক্তি নিঃশেষ করে দেওয়ার পরবর্তী মারহালা, যেখানে শত্রু তার সামনে পিছনে ও আশপাশে শক্তিশালী করার চেষ্টা করে।

এতক্ষণ পর্যন্ত তুমি একটি বিষয়ে কাজ করেছো, আর তা হলো শত্রুকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া।অতপর যখন তুমি শত্রুকে বিচ্ছিন্ন করে দিলে এবং যত সম্ভব বিশাল ভূমিতে ছড়িয়ে দিলে তখন কি অর্জিত হলো? দুর্বলতা। তারা যত বেশি ছড়িয়ে পড়ছে ততো বেশি দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। আজকে দেখবে মুজাহিদীনরা চেষ্টা করছে আমেরিকানদেরকে পুরো বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে। তারা আফগানিস্তানকে একমাত্র ময়দান বানিয়ে রাখেনি বরং তারা পুরো বিশ্বকেই যুদ্ধে ভূমি বানিয়ে ফেলছে। তারা শত্রুকে কেনিয়ার মুম্বাসাতে আক্রমণ করছে, ফলে আমেরিকানরা কেনিয়াতে সেনা পাঠাতে ও সেখানে তাদের সার্থগুলোকে রক্ষা করতে বাধ্য হচ্ছে। মুজাহিদরা ইয়ামেনে আক্রমণ করছে ফলে তারা ইয়ামেনকে রক্ষা করতে বাধ্য হচ্ছে। মুজাহিদরা পাকিস্তানে আক্রমণ করছে ফলে তারা পাকিস্তানকে রক্ষা করতে বাধ্য হচ্ছে।

তারা কি বলেনি এটা বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ? তাহলে মেনে নাও যা তুমি বলেছো!

এখন শত্রু বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করেছে। সে জানে না কোথা থেকে আক্রমন আসবে। ফিলিপাইন, অস্ট্রেলিয়া, ইয়ামান,

কানাডা , জিবুতি অথবা সোমালিয়া। সে জানেনা কোথা থেকে হামলা আসবে ...... তাই এই মুহূর্তে তোমার উপর আবশ্যক শত্রু শক্তি ও সক্ষমতাকে ক্ষয় করে ফেলা। যদি তাদেরকে বড় পরিসরে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হও , তাহলে তুমি তাকে এখানে , সেখানে -যেকোন স্থানে আক্রমণ করতে পারবে। যখন অনেক স্থানে আক্রমন করতে থাকবে তখন দেখবে শত্রু নিজেদের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করছে , সে জানে না কি রক্ষা করবে বা কি ছাড়বে !

যখন শত্রু এই অবস্থায় এসে পৌঁছাবে। তখন সে চিন্তা করবে, তার ওপর এখন আবশ্যক রসদ আসার রাস্তা নিরাপদ করা , সেনাবাহিনীর পিছন দিক , সামনের দিক ও চারপাশ সমান পরিমাণ শক্তি রাখা যাতে চতুর্দিকের আক্রমন ও প্রতিরোধ সক্ষমতা সমান হয়। কিন্তু এখন সে ছড়িয়ে আছে , তাই চতুর্দিকে তার সমান শক্তি দেওয়া সম্ভব নয়। এখন যখন দীর্ঘ একটা সময় তুমি তাকে ক্ষয় করতে থাকবে , তখন সে ভিন্ন কৌশল নিয়ে ফিকির করবে। তখন সে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করবে। নিজেকে বাঁচানোর জন্য আবশ্যক তার সেনাদেরকে গুটিয়ে আনা। এটাকে বলা হয় “প্রসারতাকে ফিরিয়ে আনা ”। তখন সে তার শক্তিকে একত্র করা শুরু করবে এবং তার পরিকল্পনাগুলোকে একটার সাথে আরেকটা মিলিত রাখার চেষ্টা করবে। কারন পরিকল্পনাগুলোকে যতবেশি একটার সাথে মিলিয়ে রাখবে সেটা ততটা শক্তিশালী হবে।

গেরিলা যুদ্ধের দ্বিতীয় মারহালা
المرحلة الموازنة

এই মুহুর্তে এসে গেরিলারা দেখতে পাবে শত্রুর কৌশল পরিবর্তন হয়ে গেছে , ফলে শত্রুর চারপাশ শক্তিশালী হয়ে গেছে। কিন্তু যখন শত্রু র চতুর্পাশ শক্তিশালী হয়ে যাবে তখন বিস্তৃত ভূমি ছেড়ে দিয়ে সংকুচিত হয়ে যাবে। এবং সেখানে এমন কিছু ভূমি আবির্ভাব হবে যাকে বলা হবে “ধূসর ভূমি ”। যেগুলো না থাকবে শত্রুর হাতে না থাকবে গেরিলাদের হাতে। এই অঞ্চলগুলোকে শত্রু বিজয় করেনি

অর্থাৎ তারা এটাকে রক্ষা করে না , আবার গেরিলাদের জন্য এখানে থাকা বা ঘাঁটি তৈরি করা সম্ভব না। গেরিলাদের জন্য শত্রুর এই সম্প্রসারণ থেকে গুটিয়ে নেওয়ার স্তরে সতর্ক থাকা আবশ্যক। হয়তো তোমাকে টেনে আনছে এবং তোমার জন্য একটি ভূমি ছেড়ে দিয়েছে , যাতে তুমি সেখানে প্রকাশিত হও। তখন তার পক্ষে তোমাকে আক্রমণ করা সম্ভব হবে এবং সর্বোচ্চ দ্রুততার সাথে তোমাকে মিটিয়ে দিবে। যেমনটা হাফেজ আসাদ সিরিয়ার ভাইদের সাথে করেছিল।

শাইখ মারওয়ান হাদীদের নেতৃত্বে যখন গেরিলা যুদ্ধ শুরু হল, তখন তারা এটার কৌশল গুলো প্রয়োগ করেছে। অতপর হাফেজ আসাদ ক্ষমতায় আসল এবং চিঠি পাঠালো যে , আমরা বৈঠকে বসবো এবং রাজ্যকে অর্ধেক ভাগ করে নেব। সাথীরা উদ্যমতা অনুভব করল এবং ভাবল শত্রু দুর্বল হয়ে গেছে। সেই সাথে সেনাবাহিনী থেকে বিভিন্ন দল এসে তাদের সাথে যুক্ত হচ্ছিল এবং তারা তাদেরকে গেরিলা যুদ্ধ থেকে পরবর্তী স্তরে বের হয়ে আসার জন্য চাপ সৃষ্টি করছিল। ফলে তারা গেরিলা যুদ্ধের পরবর্তী স্তরে বের হয়ে এসে হামা শহরকে তাদের প্রথম ঘাটি নির্ধারন করলেন। চুক্তি ছিল তিন বছরের, যা আসলে কিছুই না। যখন তারা সামনে বের হয়ে আসল , হাফেজ আসাদ সর্বোচ্চ দ্রুততার সাথে হামা শহর অবরোধ করে বিমান , ট্যাংক , কামান ইত্যাদির সমস্ত অস্ত্রের মাধ্যমে হামলা চালাল। ফলে সেখানে ৩৩ হাজার মুজাহিদ শহীদ হলেন এবং সেই সীমার বাইরে মাত্র ৭০ জন কমান্ডার আদনানের আধীনে বের হয়ে এসেছিলেন। পরে তাদের কয়েক জনকেও গ্রেফতার করা হয়।

فتجد أن العدو حريص جداً أن يوقعك في كمائن أو أن يضع لك فقاعات «اختبار» ويحاول أن يمد لك الطُعم فلا تأكل الطُعم ولا تستعجل مناطق ليس فيها عدو، لا تستعجل بالظهور بها ولست مسؤولاً عن إدارتها فحاول أن لا تستعجل أن تنتقل إلى المراحل الأخرى.

শত্রুকে দেখবে তোমাকে ফাঁদে ফেলতে এবং তোমার সামনে টোপ দিতে অনেক আগ্রহী , কিন্তু তুমি তাতে ধোকা খাবে না। যে অঞ্চলে শত্রু নেই তা দখলে তাড়াহুড়া করোনা , তাতে আত্মপ্রকাশ করতে তাড়াহুড়ো করো না। এবং পরবর্তী স্তরে চলে যেতে তাড়াহুড়া করো না।

যখন সেখানে এমন কিছু অঞ্চল থাকবে যা স্বাধীন অথবা ধূসর ভূমি। যাতে শত্রুরাও আধিপত্য করে না আবার মুজাহিদদের হাতেও নেই। তখন স্বাভাবিকভাবেই তুমি নতুন পরিস্থিতিতে কৌশল পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভব করবে , ফলে এর পরবর্তী স্তরে চলে যাবে যেটা হচ্ছে গেরিলাযুদ্ধের দ্বিতীয় স্তর। আর তা হল **مرحلة التوازن** বা "সমতার স্তর "।

সিরিয়ান ভাইয়েরা তারা যদিও বাস্তবে পরবর্তী মারহালায় চলে যাওয়ার ইচ্ছা করেছিল , কিন্তু তারা প্রথম স্তরকে পরিপূর্ণ করে নি। যে ব্যক্তি কোন একটি স্তরকে লাফ দিয়ে চলে যাবে ,ফলস্বরূপ সে নিজেকে অধঃপতিত - ধ্বংসপ্রাপ্ত দেখবে। তাই কখনোই পরবর্তীতে স্তরে যাওয়া উচিত হবে না যতক্ষণ না প্রথম স্তর পূর্ণ হচ্ছে। এবং যখন প্রথম স্তরে কোন ধরনের ঘাটতি না থাকবে , তখনই তোমার জন্য পরবর্তী স্তরে যাওয়া বৈধ হবে , তবে সতর্কতার সাথে।

স্থিতিশীলতা বা সমতার স্তরে গেরিলা যোদ্ধারা তাদের শক্তিকে শৃংখলাবদ্ধ বিন্যাস করবে। আর তা এমনভাবে করবে, শত্রু যদি তাদেরকে ফাঁদে ফেলতে চায় তাহলে যাতে তারা ফিরে যেতে পারে। অর্থাৎ যদি তারা বুঝতে পারে যে শত্রু তাদেরকে ফাঁদে ফেলছে অথবা প্রকাশ করতে চাচ্ছে , তখন তাদের পক্ষে সম্ভব হবে আবার গেরিলা যুদ্ধে ফিরে যাওয়া। এজন্য গতানুগতিক বিন্যাসের সেনারা গেরিলা যুদ্ধের মূল সেনাদের থেকে পৃথক ও বিচ্ছন্ন থাকবে। এক দল অন্য দলের সাথে মিশ্রিত হবে না। সিরিয়ার ভাইয়েরা এখানেই ভুল করেছিল , তারা নতুন সাহায্যকারী সেনাদেরকে গেরিলাদের বিন্যাসের মধ্যে মিশ্রিত করে ফেলেছিল। ফলে

তারা বিপদের মুহূর্তে নতুনদেরকে আলাদা করতে পারেনি এবং পুরাতনদেরকে নিয়ে পুনরায় গেরিলা যুদ্ধের নীতিতে ফিরে যেতে পারেনি। তাই আবশ্যক হলো, যারা পূর্বে গেরিলা যুদ্ধ করেছে তারা এসময়েও পরিপূর্ণ প্রস্তুত অবস্থায় থাকবে। সেই পূর্বের বিন্যাস, অবস্থান ও সরঞ্জামাদির সাথেই। পরবর্তীতে শুধু নতুনদেরকে নিয়ে গতানুগতিক সেনাবাহিনীর মত একটি বিন্যাস দাঁড় করানো হবে।

“ধূসর অঞ্চলগুলোর” বিভিন্ন প্রকারবেধ রয়েছে। হয়তো প্রশাসন অথবা সেনাবাহিনী সেখানে শুধু দিনের বেলা কর্তৃত্ব করে, রাতে সেখানে কোনো কর্তৃত্ব থাকে না। অথবা শুধু এক ঋতুতে কর্তৃত্ব করে কিন্তু পরের ঋতুতে ক্ষমতা থাকে না। যেমন তারা শুধু গরমের মৌসুমে দখলে রাখে সাহায্যের পথ নিরাপদ থাকায়। কিন্তু শীতের মৌসুমে বরফ-জঙ্গল বা ভিন্ন কিছুর কারণে সেখানে কর্তৃত্ব করতে পারেনা।

দ্বিতীয় স্তরের কার্যক্রম শুরু করার পর, এখানে গেরিলা কমান্ডাররা ‘লাঠির মধ্যভাগে ধরবে’ অর্থাৎ না তারা গেরিলা যুদ্ধকে ছেড়ে দিবে আর না তারা গতানুগতিক বিন্যাসে প্রবেশ করবে। কারণ এর ফলে আবার গেরিলা যুদ্ধে ফিরে আসা কঠিন হবে অথবা তাদেরকে আঘাত করা সম্ভব হবে। তাদেরকে দেখবে তারা লাঠিকে মধ্যভাগে ধরছে। তারা এমন একটি বিন্যাস করবে যেখান থেকে গেরিলা আক্রমণ পরিচালনা করা যায় আবার কিছুটা শৃংখলাবদ্ধ আকৃতি বোঝা যায়।

এখানে শৃংখলাবদ্ধ বিন্যাসের মত কিছুটা কাঠামো দাঁড় করানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে, শত্রুর উদ্দেশ্য বুঝতে পারা, কেননা কখনো শত্রু এই অঞ্চলগুলো থেকে সরে যাবে এবং তোমার জন্য রেখে যাবে এমন কিছু গোয়েন্দা সাহায্যকারী যারা সেই ভূমির জনগনের মধ্য থেকেই হবে। যাতে তাদেরকে তুমি অন্তর্ভুক্ত করে নাও, ফলে তারা তোমার বিন্যাস কাঠামো ব্যাপারে তথ্য পাচার করবে। কারণ তুমি এখন অগ্রবর্তী স্তরে প্রবেশ করছো। আর গেরিলা যুদ্ধাদের

জন্য প্রথম স্তরে বসে থাকা উচিত না বরং তাদের প্রয়োজন তাদের সীমাকে বৃদ্ধি করা এবং নতুন সাহায্যকারীকে গ্রহণ করা। তবে নতুনদেরকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে এবং সঠিক কৌশল অবলম্বন করতে হবে।

নতুনদেরকে গ্রহণ করার কৌশলঃ
তাদেরকে প্রথম স্তরের গেরিলাদের সাথে মিশ্রিত করা যাবেনা বরং প্রথম স্তরের ব্যক্তিরা নতুন সাহায্যকারীদের থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকবে। তারা কিছুটা শৃংখলাবদ্ধ বিন্যাস থেকে দূরে থাকবে যাতে তাদের থেকে ফায়দা অর্জন করা যায়। কারণ যদি আমরা পূর্বের কৌশলে ফিরে যেতে চাই অথবা শত্রু যদি নতুনদের মধ্যে তার গোয়েন্দা প্রবেশ করিয়ে রাখে, তাহলে এটা তোমাকে প্রভাবিত করতে পারবে না। তাই তোমার জন্য উচিত হবে এই সমতার স্তরে দুইটা কৌশলকেই একত্রে ব্যবহার করা।

এই স্তরে এসে তুমি অল্প অল্প করে অগ্রসর হবে এবং খুব ভালো করে পর্যবেক্ষণ করবে। শত্রু কি তোমাকে ফাঁদে ফেলছে বা তোমার মাঝে তাদের গোয়েন্দা ঢুকিয়ে রেখেছে নাকি বাস্তবেই শত্রুর এই অঞ্চলে আধিপত্য করার শক্তি নেই এবং এই অঞ্চলকে ধরে রাখার কোন সক্ষমতা নেই। তোমার কাছে দুইটার যে কোনো একটা স্পষ্ট হবে। এখন যদি এটাই স্পষ্ট হয় যে বাস্তবে শত্রুর এই অঞ্চলে আধিপত্য করার শক্তি নেই, তখন পূর্ণভাবে বিন্যাস করা শুরু করবে। তোমার সৈন্যদলকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করবে এবং বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে দিবে, যেমনটা সেনা বাহিনীতে করা হয়। অস্ত্র গনিমত নেয়া শুরু করবে এবং এটাকে স্বাধীন অঞ্চলগুলোতে নিয়ে যাবে। স্বাধীন অঞ্চলগুলোতে কৌশলগত স্ট্র্যাটেজিক স্থানগুলোকে চিহ্নিত করবে এবং সে সমস্ত স্থানে পাহারাদার নিযুক্ত করবে।পুরো অঞ্চলে নিরাপত্তা বাহিনী গঠন করবে, রসদ সরবরাহের রাস্তা তৈরি করবে, যুদ্ধের জন্য পরিখা খনন করবে। অর্থাৎ স্বাভাবিক যুদ্ধের জন্য যা প্রয়োজন সবকিছুই তৈরি করবে।

এই স্তরে এসে অর্থাৎ সমতার স্তরে শত্রু তোমাকে আক্রমণ করবে, তুমিও শত্রুকে আক্রমণ করবে। কোন একটা পরিকল্পনা ব্যর্থ হলে যুদ্ধের জন্যে অন্য কোন পরিকল্পনা নিবে। এখানে দেখবে শত্রুর বিরুদ্ধে প্রত্যেক যুদ্ধে স্থানের প্রয়োজন পড়ছে। তাই এক জায়গায় ঘাটি করার পর হাত থেকে ছুটে গেলে তোমার সাথীদেরকে নিয়ে ভিন্ন জায়গায় ঘাঁটি তৈরি করবে। এখানে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে স্থিতিশীলতা আনার চেষ্টা করবে, যাতে শত্রুর শক্তির সামনে তোমার শক্তির ভারসাম্যতা তৈরি হয়। ফলে তার পদ্ধতিতেই তাকে আক্রমন করবে তবে ভিন্ন টেকনিক এর মাধ্যমে।

প্রথম পদ্ধতি হচ্ছে, সমতাহীন যুদ্ধ। এখানে এমন কৌশল অবলম্বন করবে যা শত্রুর পক্ষে অবলম্বন করা সম্ভব না। অর্থাৎ তারা শৃংখলাবদ্ধ বিন্যাসের ক্ষেত্রে যতই শক্তিশালী হোক, তোমার জন্য কখনোই তাদের সিস্টেম অনুসরণ করা উচিত না। বরং তুমি নিজস্ব কৌশলে আগাবে। সেই কৌশল ব্যবহার করবে যা শত্রু ব্যবহার করেনি। অর্থাৎ তারা প্রতিরোধ করে তোমার কৌশলকে নষ্ট করতে পারবেনা। তোমার আক্রমণের কৌশল শত্রুর প্রতিরোধ কৌশল থেকে ভিন্ন হবে। অর্থাৎ এমন স্থানে আক্রণ করবে যেখানে শত্রু প্রতিরোধ গড়ে তোলেনি। তুমি এই স্তর অতিক্রম করে এরপর সমতার স্তরে প্রবেশ করবে। তখন সেখানে শত্রুর কৌশল ব্যবহার করে আক্রমণ করবে।

তৃতীয় মারহালা

এরপর আসবে তৃতীয় স্তর, তা হল “ধংসের মারহালা”। যেখানে তুমি ও তোমার শত্রু ব্যাপক সংঘর্ষে লিপ্ত হবে। তুমি তোমার বাহিনী দিয়ে শত্রু বাহিনীর উপর আঘাত করবে। পূর্বের স্তর গুলোতে শত্রু দূর্বল হয়ে যাওয়ার পর এভাবেই তোমার পক্ষে সক্ষম হবে শত্রুকে যুদ্ধের ময়দানে লাঞ্ছনাদায়ক পরাজয় বরণ করাতে অথবা এমন পরাজয় যার ফলে শত্রুর যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা নষ্ট হয়ে

যাবে। তখন তুমি আস্তে আস্তে সেই অঞ্চলগুলোকে দখল করবে যা শত্রুর হাতে ছিল এবং একটি রাষ্ট্র কায়েম করবে।

এই হচ্ছে তিনটি মারহালা যার মধ্য দিয়ে গেরিলাযুদ্ধ অতিক্রম করে। এখানে দেখবে সবচেয়ে দীর্ঘ মারহালা হচ্ছে, প্রথম স্তর। এবং সবচেয়ে ছোট হচ্ছে শেষ স্তর। একটি স্তর যত দীর্ঘ হবে পরের স্তর তত ছোট হবে। উদাহরণত; আফগানিস্থানে প্রথম স্তর শুরু হয় ১৩৯৪ হিজরীতে, সেখানে সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৩৯৯ হিজরীতে প্রবেশ করে। প্রথম স্তর শেষ হয় ১৪০৬ হিজরীতে এবং সমতার স্তর শুরু হয় ১৪১১ হিজরী পর্যন্ত। এবং সর্বশেষ গতানুগতিক যুদ্ধ বা তৃতীয় স্তর শুরু হয় ১৪১১ থেকে ১৪১২ হিজরী রমজান মাসে কাবুল পতন পর্যন্ত।

স্বাভাবিকভাবে, শত্রুর হাতে পরাজয়, ছিড়ে যাওয়া মালার গুটি পতনের মতো ধারাবাহিক হয়ে থাকে। অর্থাৎ রমজানে সর্বপ্রথম অঞ্চল ‘মাজার শরীফ’ পতন হয়। এবং এটা ধারাবাহিক চলতে থাকে ২০ শাওয়ালে আফগানের সম্পূর্ণ ভূমি পতন হয়। তাই তুমি দেখবে পরাজয়ের স্তরটা ছোট হয়ে থাকে।

এতক্ষণ আমরা গেরিলা যুদ্ধের তিনটা স্তর এবং প্রত্যেকটি স্তরের বৈশিষ্ট্য, গুণাবলী ও ব্যবহৃত কৌশল নিয়ে আলোচনা করেছি। এখন আমরা আলোচনা করবো, গেরিলা যুদ্ধ শুরু করার পূর্বে এটা যাচাই করা প্রয়োজন যে, আমাদের গেরিলা যুদ্ধ শুরু করার সক্ষমতা আছে কিনা। গেরিলা যুদ্ধ শুরু করতে বেশ কিছু উপাদান লাগে। এই উপাদানগুলো অনেক গুরুত্বপূর্ণ। তাই আমরা যখন গেরিলা যুদ্ধ শুরু করার পূর্বে জেনে নিবো উপাদানগুলো আছে নাকি নেই। যদি উপাদান না থাকে তাহলে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করার প্রয়োজন নেই। আর যদি সক্ষমতাগুলো পাওয়া যায়, তবে তা স্বল্প পরিমাণ হয়, তাহলে এটাকে বৃদ্ধি করে পূর্নতায় পৌছিয়ে অতঃপর যুদ্ধ শুরু করবে।

গেরিলা যুদ্ধের উপাদান সমূহ

গেরিলা যুদ্ধের উপাদানের
প্রথমটি হলো; “শরীয়তের মূল্যায়ন” অর্থাৎ তোমার দেখা প্রয়োজন এই শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বৈধ নাকি বৈধ নয়? কেননা পরিস্থিতি কখনো এমন হয় যে, শত্রুর সাথে যুদ্ধ করা বৈধ হয় কিন্তু এতে অনেক বিপর্যয় সৃষ্টি হতে পারে। তাই সর্বপ্রথম শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি জেনে নেওয়া আবশ্যক।

দ্বিতীয়তঃ “অর্থনৈতিক সক্ষমতা” তোমার কাছে কি গেরিলা যুদ্ধ শুরু করার জন্য স্বাধীন অর্থনৈতিক উৎস রয়েছে? স্বাধীন অর্থনৈতিক উৎস দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, অর্থের এমন উৎস যা নির্দিষ্ট ব্যক্তি অথবা স্থানের সাথে সীমাবদ্ধ নয়। সিরিয়ার ভাইদের ভুলগুলো থেকে একটি ভুল হল, তাদের সম্পদ শুধু ইরাক এবং জর্ডানের ভাইদের থেকে আসতো। তাই কোন গেরিলা যুদ্ধ শুরুর আগে সম্পদের উৎসকে নির্দিষ্ট কোন সীমা থেকে মুক্ত করে স্বাধীন করা আবশ্যক। যেমন ইরিত্রিয়ার ভাইদেরকে দেখবে তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয়গুলো সুদানের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এখন ইরিত্রিয়ার সাথে সুদান প্রশাসনের সম্পর্ক উন্নতি ঘটলে সীমান্তে গেরিলারা দূর্বল হয়ে পড়ে, আর তাদের সম্পর্ক অবনতি হলে গেরিলারা শক্তিশালী হয়। তাই গেরিলাদের জন্য গেরিলাযুদ্ধের ক্ষেত্রে আবশ্যক হচ্ছে, অর্থনৈতিক এমন উৎস থাকবে যা পার্শ্ববর্তী দেশ, সময়, স্থান বা কোন রাজনৈতিক ঘটনায় প্রভাবিত হবে না।

তৃতীয়তঃ উপযুক্ত “রাজনৈতিক শক্তি” অর্থাৎ রাজনৈতিক এমন অবস্থা যা জনগনের উপর প্রভাব সৃষ্টি করবে এবং তাদেরকে বিস্ফোরিত করবে। ফলে এর মাধ্যমে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করার উদ্যোগ বা কাজ শুরু করতে পারবে।

চতুর্থতঃ “ভৌগলিক সক্ষমতা” যার আলোচনা পূর্বে হয়েছে। সেখানে আলোচনা হয়েছে মরুভূমি যুদ্ধের উপযুক্ত নয়। কোন অঞ্চল যদি অনুপযুক্ত হয় বা আবদ্ধ হয়, যেখানে হয়ত কোনো সীমা নেই অথবা সেখানে কোন পানি নেই, অনেক বেশি শুষ্ক। তাহলে সেখানে যুদ্ধের প্রয়োজন কি? পানির ঝরনা ছাড়া পাহাড়ে হয়তো অনেক ফায়দা অর্জন করতে পারবে। কিন্তু পানির ঘাটতি উপর কর্তৃত্ব করা অনেক কঠিন হবে। তাই তোমার জন্য ভৌগলিক সক্ষমতা প্রয়োজন।

যদি শত্রুর বিমান থাকে এবং অঞ্চলটা যদি জঙ্গল হয়; তাহলে এটাই তোমার উত্তম স্থান হবে। অন্যদিকে পাহাড় উত্তম হবে, যদি শত্রুর যুদ্ধযান বেশি হয়। অথবা এমন বিশাল শহর যেখানে ঘনবসতি বেশি, যা ছোট ছোট রাস্তা বিশিষ্ট। এই সবগুলো হচ্ছে ভৌগলিক সক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত। এখন যদি সেখানে এমন কোন শহর না থাকে যেখানে যুদ্ধ করা যাবে, বরং শুধু মরুভূমি রয়েছে। যেমন ইরিত্রিয়া, সেখানে বিশাল মরুভূমি রয়েছে। মুজাহিদরা একটা আক্রমণের জন্য ৩০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দেয় এবং আবার পূর্বের স্থানেই ফিরে আসে। তুমি দেখবে তাদের অবস্থান গুলো উম্মুক্ত। তাই যেমনভাবে তোমার সহায়ক ভূমি দরকার, ঠিক তেমনিভাবে সেই ভূমির ভৌগলিক অবস্থান উপযুক্ত হওয়া আবশ্যক। যে কোন ভূমি পেলেই যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়া যাবে না।

তোমার প্রয়োজন হবে জনসংখ্যার শক্তি, তা হলো জনগণকে বিন্যাস করা। মানুষ বিভিন্ন গোত্রে ভাগ হয়ে থাকে। তুমি সেখান থেকে উপকার লাভ করতে পারবে। জনগণকে গঠন করার মাঝে রয়েছে, আকিদা-বিশ্বাসের দিক থেকে গঠন করা। যদি তুমি খ্রিস্টান ভূমিতে বা যে ভূমিতে এমন ব্যক্তিদের আধিক্য রয়েছে যারা তোমার সাথে আকিদার দিক থেকে যুদ্ধ করে, যেমন রাফেজী, ইসমাইলি ইত্যাদি। তাহলে তোমার প্রয়োজন হবে এমন ভূমির যার অধিকাংশ জনগন আকিদার ক্ষেত্রে তোমার সমর্থক অথবা তাদের সমর্থন লাভ করতে তুমি সক্ষম হবে।

আলজেরিয়ার ভাইগণ অপারেশন পরিচালনা করা ও ঘাঁটি তৈরী করার জন্যে ‘বারবার’দের এলাকায় চলে গিয়েছিলো। বারবারদের মাঝে সবচেয়ে শক্তিশালী দল ছিল কমিউনিস্টরা। এছাড়া তাদের মাঝে এমন কঠিন বারবারী জাতীয়তাবাদ ছিল, যার ফলে তারা আরবীদের ঘৃণা করতো। ইসলাম তাদের মাঝে খুবই দূর্বল ছিল। আরো সমস্যা হচ্ছে তুমি হয়ত এমন কিছু গোত্র বা মানুষ পাবে যাদের উপর ভীরুতা, কাপুরুষতা ও নির্বুদ্ধিতা বিজয় লাভ করেছে। এ সমস্ত এলাকায় যুদ্ধ করাটা খুবই কঠিন। এ সমস্ত এলাকায় যুদ্ধ করলে তুমি নিজেরই ক্ষতি করবে।

আফগানিস্তান এমন একটি ভূমি যা যুদ্ধের জন্যেই তৈরি করা হয়েছে অর্থাৎ এটা সব ধরনের যুদ্ধ উপযোগী ভূমি। এমনকি এখানের জনগণ সত্যবাদী, আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন, সহনশীল ও তাদের অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এতো যুদ্ধ-ধ্বংসযজ্ঞ আফগান ছাড়া অন্য কোথাও হলে তারা ধৈর্য ধরতে সক্ষম হতো না। এরকম অবস্থায় ধৈর্য ধারণ করাটা অন্যদের পক্ষে অনেক কঠিন। তারা তাদের দেশে একের পর এক যুদ্ধ ও ধ্বংসের সম্মুখীন হয়েছে, এক যুদ্ধের পর এই আরেক যুদ্ধ। তুমি কি ধারণা করো, সেখানেই এমন কাউকে পাওয়া যাবে যে জিহাদ নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করে? এটা সম্ভব না। কেননা তারা হল শক্তিশালী জাতি, তারা প্রতিরোধকারী জাতি ও মজবুত হিম্মতের অধিকারী। সুতরাং যুদ্ধের পূর্বে জনসাপোর্ট তৈরির উপাদান তোমার জন্য অনেক জরুরী।

যুদ্ধের আরেকটি উপাদান হলো সীমান্তবর্তী দেশের আধিক্যতা, অর্থাৎ বিভিন্ন রাষ্ট্রের সীমানা গেরিলাদের জন্য জরুরী। যেমন চেচনিয়া, যার সাথে মাত্র দুটি রাষ্ট্রের সীমানা রয়েছে;রাশিয়া ও জর্জিয়া। এখানে যুদ্ধ করা উত্তম নাকি আফগানিস্তান যার সীমানা আটটি রাষ্ট্রের সাথে রয়েছে? তুমি দেখতে পাবে, সীমান্তবর্তী সবগুলো রাষ্ট্র একই সময়ে এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে একত্র হবে না, ফলে তাদের সীমান্ত ব্যবহার করতে পারবে। তাই এই

সক্ষমতাটাও খুঁজে নেওয়া আবশ্যক। এতে আন্দোলন এর জন্য তুমি একটি যুৎসই জায়গা খুঁজে পাবে।

এজন্য যুদ্ধবিদরা বলেন, যে দেশে আন্দোলন হবে তার সীমান্তটাও উত্তম সীমানা হওয়া চাই। কেননা উদাহরণত; আংগুল তিনটি জিনিস ছাড়া নড়তে পারে না, হাড্ডি, শিরা ও পেশী। এমনিভাবে কোন জিহাদি আন্দোলন এই তিনটি ছাড়া সম্ভব নয়। যার হাড্ডি হল যুবকগণ। মাত্র ১০ জন ব্যক্তির মাধ্যমে জিহাদী আন্দোলন করা সম্ভব নয়। তুমি তো উম্মাহকে স্বাধীন করার আন্দোলন করছো, তাই তোমার জন্য আবশ্যক হল উম্মাহর যুবকদেরকে আন্দোলনে শরিক করা। তোমার আন্দোলনের হাড্ডি লাগবে আর যুবক সৈনিকরা হল হাড্ডি। অতঃপর শিরা, জিহাদের জন্য মাল হল শিরা সমতুল্য। সুতরাং সম্পদ সংগ্রহ করা জরুরী। সম্পদ ছাড়া তুমি কিছুই করতে পারবে না। এরপর প্রয়োজন মাংসপেশী, এটা হল যুদ্ধের অন্যান্য উপাদান সমূহ। অর্থাৎ সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য প্রস্তুতি গুলো। তবে আকিদার প্রস্তুতি হলো মূল ও সবকিছুর পূর্বে।

এই সবগুলোই হলো শক্তি। আর এগুলো যত বাড়বে জিহাদের জন্য তোমার সক্রিয়তা বৃদ্ধি হবে। এমন কাউকে পাওয়া যাবে না, যে এই সক্ষমতা গুলো ছাড়া যুদ্ধের ফ্রন্ট চালু করতে পারবে। যে বলবে; “না, আমার এগুলো দরকার নেই। আমি গেরিলা যুদ্ধ শুরু করতে চাই” সে ব্যর্থ হবে। কেননা কোন উপাদান ছাড়া যুদ্ধ শুরু করলে, গেরিলা যুদ্ধে পৌঁছার আগেই তোমাকে শেষ করে দেওয়া হবে। সুতরাং এই উপাদান গুলোর প্রতি যত্নশীল হও। এখানে কিছু ইসলামী আন্দোলনের ভুল হয়েছে। তারা ধারণা করেছিল তাদের যুদ্ধের উপকরণ পূর্ণ হাসিল হয়ে গেছে। ফলে তারা যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধ শুরু করার পর দেখল উপাদানগুলোর পূর্ণতা ক্ষেত্রে তারা এখনো অনেক দূরে। তখন উপাদানগুলোর পূর্ণতা পাওয়ার আগ পর্যন্ত তারা ফিরে যায়।

যেমন মিশরের “জামাতুল জিহাদ”, তারা উপাদান পূর্ণতা পেয়েছে ভেবে যুদ্ধ শুরু করে দিল। পরে দেখল যে, না এখনো তাদের উপাদান এখনো পূর্ণ হয়নি। ফলে তারা পূর্ণতার জন্য ফিরে গেল। তারা দেখল, মুরতাদ শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে জনগন মেনে নিচ্ছে না। কেননা তাদের মাঝে ইরজা ব্যপকভাবে ছিল। তারা সরকারকে মুরতাদ মানতে রাজি ছিল না। সুতরাং এটা মূল বিষয়, এটা মূল বিষয় এবং এটা মূল বিষয়। ইহা খুব কঠিন বিষয় যে, তুমি তাদেরকে তৃপ্ত করে দিবে এই কথা বলে যে, এরা মুরতাদ শাসক, যুদ্ধ তো পরের বিষয়।

তাই এই উপাদানটি অর্থাৎ শরীয়তের উপাদানটি গুরুত্বপূর্ণ। উম্মাহর নিকট এবং যে জাতি যুদ্ধ করতে চায় তাদের নিকট এই ফিকির পৌঁছে দেওয়া খুবই জরুরী। শরিয়ার এই চিন্তা তাদের নিকট পৌঁছাতে হবে। কেননা যুদ্ধ তুমি একা করবে না। তোমার সাথে উম্মতে মুসলিমাও লড়বে। তুমি জনগণকে নিয়ে যুদ্ধ করবে, একা পারবে না। লড়াইয়ের ক্ষেত্রে আবশ্যক হল সাপোর্ট যেন তোমার পাশে থাকে। সাধারণত মানুষ জীবনধারণের সকল উপকরণের অধিকারী হয়ে থাকে এবং সেখান সমস্যাযুক্ত কোন কিছু থাকে না। এখন যে সরকার তাদেরকে সকল প্রয়োজন পূর্ণভাবে দিচ্ছে, তার বিরুদ্ধে যদি জিহাদের ডাক দাও তখন দেখবে মানুষকে এটা বুঝানো খুবই কঠিন। আর যদি যুদ্ধ শুরু করে দাও তাহলে দেখবে, তোমার পেছনে তুমি ছাড়া আর কেউ নেই।

গেরিলা যুদ্ধের জন্য আবশ্যক হচ্ছে, যখন তারা যুদ্ধ শুরু করবে; এই যুদ্ধকে পূরা উম্মতের জন্য ব্যপক করে দিবে। তুমি চিন্তা করো না যে, তুমি একাই একটা ইসলামী রাষ্ট্র হয়ে যাবে। তুমি আর তোমার সাথে ২ হাজার মুজাহিদ মিলে কোন ভূমি স্বাধীন করতে পারবে ঠিক, কিন্তু দাওলাতে ইসলামিয়া কায়েম করতে পারবে না। সুতরাং তোমার উপর আবশ্যক অর্থনৈতিক সক্ষমতা অর্জন করা, রাজনৈতিক সক্ষমতা অর্জন করা এবং জনগণকে শরিয়াগত দিক থেকে তোমার বিষয়গুলোকে পূর্ন আস্বস্ত করা। যদি তারা তোমার সাথে

থাকে তাহলে তারাই হবে তোমার যুদ্ধের ঘাটি। তুমি একটি রাষ্ট্র গঠন করলে, কিন্তু তোমার সাথে জনসমর্থন নেই। তাহলে কি ফায়দা?

আমাদের জিহাদের উদ্দেশ্য হলো, মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে মানুষের রবের দাসত্ব্যের দিকে নিয়ে যাওয়া। উদ্দেশ্য যখন এটাই, তাহলে কারো সমর্থন ছাড়া একা কাজ করলে তোমার অবশ্যই পতন হবে। তাই উপাদানগুলো পূর্ণ প্রস্তুত থাকা আবশ্যক। এই জন্য আমরা দেখতে পাই, যে সমস্ত জিহাদি আন্দোলন এই উপাদানগুলো নিয়ে যুদ্ধ শুরু করেছে তারা অবশ্যই সফল হয়েছে। আর যারা এগুলো অবহেলা করেছে এবং ভেবেছে এটা তো আমাদের ভূমি, তারা ব্যর্থ হয়েছে। যেমন সোমালিয়ার জিহাদি আন্দোলন সফল হয়েছে, কারণ তারা এই উপাদানগুলো যথাযথভাবে নিয়েছে। তারা আমেরিকা ও ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে তাদের জিহাদী উপাদানগুলো পূর্বভাবে পেয়েছে, তাই তারা সোমালিয়াতে সফল হয়েছে। চেচনিয়াতে প্রথমবার জিহাদি আন্দোলন সফল হয়েছে। আফগানিস্থানে সফল হয়েছে।

যে জিহাদী জামাতগুলো এইসব উপাদান ভালো ভাবে গ্রহণ করেছে, তুমি দেখবে তারাই সফল হয়েছে। আর যে জামাতগুলো এই কথার উপরে অটল ছিল যে, এটা তো আমাদের ভূমি, এখানে এত কিছুর দরকার নেই। আবশ্যই আমরা এখানে যুদ্ধ করবো। এবং “তোমরা যুদ্ধ কর তোমাদের নিকটবর্তী শত্রুদের বিরুদ্ধে” এই আয়াত দ্বারা দলিল দেয়, তারা ব্যর্থ হয়েছে। তাদের এই কথাটি শরীয়তের দৃষ্টিতেও সঠিক নয়, কৌশলগতভাবে ও সঠিক না। লিবিয়ার জিহাদী আন্দোলনের ভাগ্যে কি ঘটেছে? তারা অটল ছিল এর উপর যে, এটা তাদের ভূমি। এবং তারা তাদের ভূমিতে যুদ্ধ করবে। কিন্তু পরে কিছুই অর্জন করতে পারেনি বরং ব্যর্থ হয়েছে। কারণ তাদের নিকট যুদ্ধের উপাদান-সক্ষমতা ছিলনা। কেননা লিবিয়ার ভুমি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত নয়, সেখানে অনেক বেশি উপাদান দরকার। মিশরের জামাতুল মুজাহিদীন তেমনি ভাবে উপাদান ছাড়া যুদ্ধ শুরু করেছিল, ফলে সফল হয়নি।

তাই তোমার উচিত উপাদান পূর্ণ সংগ্রহ করে যুদ্ধ শুরু করা, এর ফলে তুমি সফল হবে। এটা কখনো বলবে না, উপকরন ছাড়াই আমি গেরিলা যুদ্ধের স্তরগুলো প্রয়োগ শুরু করব এবং বিজয়ী হয়ে যাব। কিছুক্ষণ আগে সমতার স্তর আলোচনা হয়েছে, যেখানে তোমার বিশাল সংখ্যক সাহায্যকারী দরকার। যাদের মাধ্যমে সমতার স্তর থেকে শত্রুকে পরাজিত করার স্তরে যেতে পারবে। তুমি তখনই সমতার স্তরে যেতে পারবে যখন জনগণ তোমাকে সাহায্য করবে। যদি সাপোর্ট না থাকে তাহলে কোনো ভাবেই সেই স্তরে পৌঁছতে পারবে না। তাই এই উপাদানগুলো আলোচনা অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

এখানে যুদ্ধের উপাদানের মধ্যে আরেকটা বিষয় রয়েছে যা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। তা হলো, তুমি কিভাবে যুদ্ধ শুরু করবে তার ফিকির না করে কিভাবে ধারাবাহিক চালিয়ে যাবে সেটার চিন্তা করবে? কারণ অল্প কয়েকজনের পক্ষেই সম্ভব একটা গেরিলা যুদ্ধ শুরু করে দেওয়া। কিন্তু এটা তো শুধু শুরু করে দেয়ার বিষয় নয়, বরং মূল বিষয় হচ্ছে কে এটাকে ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে যাবে। তাই তোমার উপর আবশ্যক, কাদের মাধ্যমে যুদ্ধকে চালিয়ে নিবে তার ব্যাপারে ফিকির করা। এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। তুমি সর্বদাই নিশ্চিত হয়ে নিবে যে, এই সক্ষমতা পূর্ণভাবে বিদ্যমান রয়েছে কিনা।

একটা স্বাভাবিক বিষয় চিন্তা কর, গত ১০ বছর আগে আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ক্ষেত্রে মানুষের মানসিকতা কেমন ছিল, আর আজকে তাদের চিন্তা কেমন। এখানে কি কোন পরিবর্তন নেই? মুসলিম উম্মাহর পক্ষ থেকে কি কোন সাহসিকতা প্রকাশ পাচ্ছে না? যুবকরা বীরত্ব দেখাচ্ছে, ইসলামী আন্দোলন গুলো দুঃসাহসিকতা দেখাচ্ছে এবং প্রত্যেকেই আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধে এগিয়ে আসছে। অথচ দশ বছর আগে এমন ছিলনা, বিশেষ করে উপসাগরীয় যুদ্ধের পরপরই। তখন কারও পক্ষে আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধের চিন্তা করাও সম্ভব ছিল না। প্রত্যেকেই শায়খ উসামাকে

নিয়ে ঠাট্টা করতো, যখন তিনি সেই সময়ে আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধের আহ্বান করতেন। এরপর আজ এমন একটি সময় এসেছে যখন তুমি দেখবে, সমস্ত জিহাদি দল বুঝতে পেরেছে, মুসলিম উম্মাহর জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী সিদ্ধান্ত হচ্ছে আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। তাই গেরিলা যুদ্ধের এই স্তরে এমন অনেক কঠিন সময় আসবে যা অতিক্রম করবে এই সক্ষমতা গুলো সাথে, এগুলোই হচ্ছে গেরিলাযুদ্ধের উপাদান যা তোমার প্রয়োজন। এরপর তুমি গেরিলা যুদ্ধের তৃতীয় স্তরে প্রবেশ করবে।

পূর্বের আলোচনায় আমরা জানতে পারলাম শৃংখলাবদ্ধ বাহিনীর বিন্যাস, নিয়ম-নীতি, দুর্বল পয়েন্ট এবং গেরিলা যুদ্ধের বিন্যাস, গেরিলা যুদ্ধের বৈশিষ্ট্যসমূহ, গেরিলা যুদ্ধের উপাদানসমূহ ও গেরিলা যুদ্ধের স্তরসমূহ।

গেরিলা যোদ্ধাদের প্রস্তুতি

এখন ধরে নিলাম, আমরা গেরিলা যুদ্ধ শুরু করেছি। এখানে অবশ্যই শত্রুর সাথে ফাইট করার প্রয়োজন হবে। তাই গেরিলা যুদ্ধের উপাদানগুলোর মধ্যে আরেকটা হচ্ছে, তোমার সেনাদেরকে সামরিক প্রশিক্ষিত করা। গেরিলা যুদ্ধ শুরু হবে সেই ভূমির সর্বোত্তম ব্যক্তিদের মাধ্যমে। এই যুদ্ধটা ধারাবাহিক টিকে থাকবে গেরিলা কমান্ডদের মাধ্যমে। এ যুদ্ধের প্রথম দিকের সবাই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে এবং তারা সকলেই হবে যুদ্ধকে ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে নেওয়ার জ্বালানি। তাই যুদ্ধের প্রথম প্রজন্ম শান্তিতে থাকলে কখনোই যুদ্ধের ধারাবাহিক অগ্রগতি টিকবে না। যেমনটা শাইখ আব্দুল্লাহ আজ্জাম রাহিঃ বলেছিলেনঃ- “যুদ্ধের প্রথম প্রজন্ম, যারা জিহাদের দাওয়াত মানুষের কাছে পৌঁছাবে। তারা যেন এটা মাথায় রাখে যে, তাদের উপর চার তাকবীর বলা হবে।”

তাই তোমার এই ধরনের লোক প্রয়োজন, আর এটাই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সাথীদের প্রস্তুতির পদ্ধতি, সাথীদেরকে সৈন্য বানানোর পদ্ধতি ও তাদের ভিতরে চিন্তাধারা ভালোভাবে রোপণের পদ্ধতি, এই সবকিছুর জন্য অনেক মেহনত দরকার। এই সব প্রস্তুতি সম্পন্ন হওয়ার পর আমাদের উচিত গেরিলা যুদ্ধ শুরু করা। গেরিলা যুদ্ধের প্রথম প্রজন্ম যারা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে, তাদের দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় প্রস্তুত থাকতে হবে।

গেরিলাদের দৃষ্টিভঙ্গি গেরিলা যোদ্ধাদের মানসিক ভাবে প্রস্তুত করার জন্যে এই তিনটা বিষয় বাস্তবায়ন আবশ্যক। তা হলো; শরীয়াহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশ্বাস, সঠিক চিন্তাধারা, ইলমী কর্মপদ্ধতি।

প্রথমতঃ শরয়ীহ দৃষ্টিকোণ থেকে জিহাদকে বুঝতে পারা এবং শরীক হওয়া। তাই কোন আবেগী ব্যক্তিকে জিহাদে নিয়ে আসবে না। শুধু আবেগ নিয়ে যে তোমার কাছে আসবে, তাকে ফিরিয়ে দাও। আর যে ব্যক্তি আক্বিদাহ ও মাসআলায় পূর্ণ আস্থা ও সন্তুষ্টি নিয়ে আসবে, তাকেই তোমার প্রয়োজন। সে তোমার সাথে ধারাবাহিকভাবে থাকবে। যেমনটা শায়খ আব্দুল্লাহ আজ্জাম রাহিঃ যখন কিছু যুবককে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন এবং কিছু যুবক যখন দেখল আফগানীরা সিগারেট খাচ্ছে, তখন তাদেরকে গালি দিচ্ছিল। তখন শাইখ বললেনঃ ‘যাকে কোন নির্যাতনের দৃশ্য যুদ্ধে নিয়ে এসেছে, অন্য আরেকটি অপ্রীতিকর দৃশ্য তাকে যুদ্ধ থেকে ফিরিয়ে দিবে। আর আক্বিদাহ যাকে এই যুদ্ধে নিয়ে এসেছে; তাঁর শুধু মৃতদেহ ময়দান থেকে ফিরে যাবে’।

এজন্যই শাইখ আব্দুল্লাহ আজ্জাম রহিমাহুল্লাহর কাছে যখন নওয়াজ শরীফ চিঠি পাঠিয়ে বললঃ ‘আরব বিশ্ব, আমেরিকা ও অন্যদের আক্রমণের ফলে আপনাকে কিছু সুযোগ দেওয়া হয়েছে, যাতে আপনি আফগানিস্তান ও পাকিস্তান থেকে বের

হয়ে যান’। তখন আব্দুল্লাহ আজ্জাম মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেনঃ ‘আফগানিস্তানের এই ভূমিকে যুবকরা আমার দাওয়াত ও আহবানের কারণে বুকের তাজা রক্ত দিয়ে সিঞ্চিত করেছে, এখান থেকে আমি মৃত লাশ বা শিকলবদ্ধ অবস্থা ছাড়া কখনই বের হব না’। বাস্তবেই সেখান থেকে তার মৃত লাশ বের হয়েছিল রবের প্রশস্ত রহমতের দিকে ইনশাআল্লাহ।

তাই তোমার জন্য আবশ্যক যুবকদেরকে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে পূর্ণ আশ্বস্ত করা। শরয়ীহভাবে পূর্ণ নিশ্চিত করা। এই দৃঢ় বিশ্বাস ও জ্ঞান তাদেরকে যুদ্ধের ময়দানে টিকিয়ে রাখবে। যেমনটা সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা ছিল। আজকে যদি কোন ভাতিজা যুদ্ধ করতে আসে জিহাদী নাশিদ শুনে অথবা কোন নির্যাতনের দৃশ্য দেখে, সে কখনো যুদ্ধ করবে না। কারণ তাকে যে আবেগ এখানে নিয়ে এসেছে তা মুহূর্তে চলে যাবে।

উবাই ইবনে সলুলের ছেলে আব্দুল্লাহ এসে আল্লাহর নবীকে বলছিল, ‘আমি তাকে হত্যা করতে চাই, তাই অন্য কাউকে হত্যা করার অনুমতি দেবেন না’। সে তার বাবাকে হত্যা করবে এবং অন্য কাউকে তাকে হত্যা করতে দিচ্ছে না। অনেক সাহাবী জাহিলি যুগের সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তিদের মুখামুখি হয়েছিল। বন্দীদের ক্ষেত্রে ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছিলেন, যখন রাসূল সা. আবু বকর, ওমর ও সাহাবা রাজি. এদের কাছে পরামর্শ চেয়েছিলেন। তিনি এই শরিয়াহর প্রতি বিশ্বস্ততার শক্তি থেকে বলেছিলেনঃ ‘আমি মনে করি আমাদের প্রত্যেককে বন্দীদের মধ্যে তার সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তিকে হত্যা করার আদেশ দিন, যাতে ইহা আমাদের জন্য দলিল হতে পারে। এমন দলিল যা বাতিল থেকে হককে চিনাতে পারবে। আমি আমার সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তিকে হত্যা করবো। অন্যদিকে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ফিদিয়া নেওয়ার পরামর্শ দিলেন। তখন আল্লাহর নবী ফিদিয়া নিয়ে ছেড়ে দিলেন, ফলে আল্লাহ তা'আলা সূরা আনফালে তাদের নিন্দা করেছেন, “কোন নবীর জন্য উচিত নয় তার কাছে বন্দী রাখা, যতক্ষণ না

জমিনে রক্তপাত ঘটানো হবে”। এইভাবে আল্লাহ তাআলা ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর কথাকে শক্তিশালী করেছেন। এবং অন্যদের কথাকে নিন্দা করেছেন।

গেরিলা যুদ্ধে প্রবেশ করার আগে এই ব্যাপারে আশ্বস্ত থাকা আবশ্যক। আর এটাই হচ্ছে প্রথম বিষয়, শরীয়াহর ক্ষেত্রে বা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে পূর্ণ আশ্বস্ত হওয়া।

দ্বিতীয় বিষয় হলো, “সঠিক চিন্তাধারা ও মানহাজ”। তোমার কাছে শরীয়তের বুঝ রয়েছে, কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গি যদি সঠিক না হয় তাহলে এই শরীয়তের বুঝ কোন ফায়দা দিবেনা। সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া এই বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না যা তাকে সঠিক স্থানে রাখবে, আর তা হচ্ছে ফিকহ। কিন্তু আমাদের এটা প্রয়োজন দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে। আমরা এটাকে শুধু ফিকাহ নামকরণ করতে পারি না, কারণ শুধু শরীয়তের মাসায়েল নিয়ে আলোচনা নয় বরং এটা পুরা জীবন পরিচালনার পদ্ধতির সাথে সম্পর্কযুক্ত। উদাহরণত; তোমার বিশ্বাস রয়েছে যে এই সরকার কাফের। অর্থাৎ তুমি যেই সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাও সে কাফের। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে তোমার এই বিশ্বাস যুদ্ধে সফলতার জন্যে যথেষ্ট নয় যতক্ষণ না, এই মুহূর্তে প্রশাসনের সাথে আচরণের পদ্ধতি বুঝতে না পারবে। কেউ চিন্তা করল, “তারা যেহেতু কাফের, তাই যে কোন পদ্ধতি ব্যবহার করে আক্রমন করবো” এটা সঠিক নয়। বরং সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি বা মানহাজ থাকা আবশ্যক।

নববী যুগের মুনাফিকদের ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম ছিল, “তারা জঘন্য কাফের”। কিন্তু নবী তাদেরকে হত্যা করেননি, কেননা এতে অনেক বিপর্যয় সৃষ্টি হবে। তাই এখানে মুলনীতি হচ্ছে; কোন জিনিস শরীয়তে বৈধ হলেই তা প্রয়োগ বৈধ নয়, অর্থাৎ শরীয়তের জ্ঞানকে রাষ্ট্র, মানুষ, জনগণ ইত্যাদি সবকিছুর সাথে প্রয়োগ করার জন্য সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি বা মানহাজ দরকার। অর্থাৎ এটা এমন যা তোমার পুরো জীবনকে পরিচালনা করবে।

বিশ্বাস ও শরীয়তের ক্ষেত্রে আশ্বস্ততা এবং সঠিক চিন্তাধারা যা আমাদের কার্যক্রম, বন্ধু-শত্রুর সাথে আচরণবিধি ঠিক করে দেবে, এগুলো অর্জনের পর আসবে তৃতীয় বিষয়। তা হলো, ‘ইলমী কর্মপদ্ধতি’ অথবা যাকে নামকরণ করা হয় ‘জ্ঞান ভিত্তিক পরিকল্পনা’ বা ‘ইলমী মানহাজ’। অর্থাৎ এখানে আরো একটি কর্মপদ্ধতি আছে যার ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়া আবশ্যক। উদাহরণস্বরূপঃ আমি চাচ্ছি একজন ব্যক্তিকে নিয়ে আসতে এবং তার থেকে আমরা আশা করছি, আক্রমনকারী শত্রুর বিরুদ্ধে সামরিক কার্যক্রম শুরু করবে। কিন্তু এই ব্যক্তিটি পূর্ণ আশ্বস্ত নয় যে, এই আক্রমণকারী শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ওয়াজিব। অর্থাৎ সে পূর্ণ আশ্বস্ত নয় যে, জিহাদ ফরজে আইন। তাকে আমাদের সাথে সংযুক্ত করা কি সঠিক হবে? তার মধ্যে তো শরীয়াহর দিক থেকে আশ্বস্ততার শর্ত বাস্তবায়িত হয়নি। তাকে আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। সে পরিপূর্ণ বিশ্বাস করে না যে জিহাদ ফরজে আইন, পূর্ণ নিশ্চিত না যে প্রশাসন মুরতাদ এবং আরো অনেক শরীয়তের মাসায়েল এর ব্যাপারে আশ্বস্ত নয়। সে আমাদের সাথে আসার দরকার নেই।

তবে এখানে শরীয়তের ক্ষেত্রে কিছু মৌলিক ও শাখাগত বিষয় রয়েছে। অর্থাৎ তুমি একজনের ব্যপারে বললে যে, “তাকে আমাদের প্রয়োজন নেই।” আমি জিজ্ঞেস করবো, “কেন প্রয়োজন নেই?” বলা হবে, সে ‘নিহত ব্যক্তির সরঞ্জাম হত্যাকারীর অধিকারে’ এই মাসয়ালায় আশ্বস্ত নয়। এটা হচ্ছে শাখাগত মাসায়ালা। নিহত ব্যক্তির সরঞ্জাম হত্যাকারী হবে, নাকি মুজাহিদদের হবে নাকি ইমারতের হবে, এটা নিয়ে ফুকাহাদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। সে শাখাগত বিষয়ে মতানৈক্য করলে এটা বুঝবে না যে, তার সাথে কাজ করা সম্ভব না। বরং আমরা কথা বলছি মৌলিক উসুল নিয়ে, সে কি উসুল এর প্রতি আশ্বস্ত নাকি আশ্বস্ত নয়?

দ্বিতীয় বিষয়টা ছিল সঠিক চিন্তাধারা, এখানে তুমি কাউকে দেখতে পাবে প্রশাসনকে তাকফীর করে অথবা শত্রুকে

তাকফীর করে। কিন্তু সে এমন কিছু কাজ করছে যা তাকে বলা হয়নি। যার ফলে শত্রুকে তোমার উপর টেনে আনছে, এখানে আক্রমণ করছে, সেখানে আক্রমণ করছে, এখান থেকে সম্পদ ছিনিয়ে নিচ্ছে তো সেখানে হত্যা করছে। তোমার এই ধরনের ব্যক্তি প্রয়োজন নেই বরং তোমার প্রয়োজন এমন সঠিক চিন্তাধারার ব্যক্তি, যে বিষয়গুলোকে পরিমাপ করবে। আক্রমণ গুলোর মধ্যে উপকারী ও অপকারী পার্থক্য করতে পারবে। এখন আক্রমণ করা প্রয়োজন নাকি প্রয়োজন নয়, অপেক্ষা করবে নাকি বসে থাকবে ইত্যাদি নির্ধারণ করতে পারবে। এমন নয় যে, তার সামনে কোন কাফের পেয়েছে তো যা ইচ্ছা তা করে ফেলবে।

আল্লাহর নবী বলেছেনঃ ‘হাবাসাকে ছাড় দাও যতটুক তোমাদেরকে ছাড় দিয়েছে, তুর্কিদেরকে ছাড় দাও যতটুক তারা ছাড় দিয়েছে’। তিরমিজির হাদিস যদিও দুর্বলতা আছে।

উলামায়ে কেরাম এখান থেকে দলিল পেশ করেন যে, শরীয়তে জায়েজ এমন সবই প্রয়োগ জায়েজ নয়। কখনো কোন শরীয়তের হুকুমের মধ্যে এমন কিছু বিষয় প্রবেশ করে যা তাকে মাকরুহ অথবা হারামের দিকে নিয়ে যায়। আর এটা হচ্ছে শরীয়তের মধ্যে ব্যতিক্রম যা মৌলিক কোনো বিষয় নয়। তাই যখনই আমরা কোন কাজ করতে যাবো, তখন বলবঃ “আসো, আমরা প্রথমে উপকার ও ক্ষতি নিয়ে চিন্তা করি। এবং আমরা এই দুইটার মাথায় রেখেই কার্যক্রম পরিচালনা করব।” তবে এই উপকার ও অপকারের ক্ষেত্রেও শরিয়তের নির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে।

তাই আমাদের প্রথমে সঠিক চিন্তাধারা প্রয়োজন, অতঃপর ইলমী কর্মপদ্ধতি প্রয়োজন। কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয় যে, এমন কোন ব্যক্তিকে নিয়ে আসা; যে তার কাজের প্রতি আশ্বস্ত নয় বরং কিছু তাত্ত্বিক দর্শন লালন করে। তুমি তাকে কাজে নিতে চাইছো, অথচ সে আমাদের কোন উপকার করবে না। তোমরা দেখবে বর্তমানে অনেক যুবক, আলেম ও বক্তাদের

মধ্যে তাত্ত্বিক কথার ফুলঝুরি ছাড়া আর কিছুই নেই। বরং শুধু ‘বলে ও বলা হয়’ এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

সুতরাং গেরিলা যোদ্ধাদের মানসিক ভাবে প্রস্তুত করার জন্যে এই তিনটা বিষয় বাস্তবায়ন আবশ্যক। তা হলো; শরীয়াহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশ্বাস, সঠিক চিন্তাধারা, ইলমী কর্মপদ্ধতি।